ক্যারিয়ার গঠনে সংযোগ স্থাপন ও আচরণ

ইউনিট 3

ভূমিকা

সব কাজের জন্যই সংযোগ স্থাপন করা জরুরি। ক্যারিয়ার, পেশা বা জীবনে সাফল্যের জন্য অবশ্যই বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে সংযোগ স্থাপন করতে হবে। মানুষ যেমন একা চলতে পারে না; তেমনি কারো সহযোগিতা ছাড়া ক্যারিয়ারের শীর্ষে পৌঁছানো যায় না। এই সহযোগিতা যে শুধু অর্থ দিয়ে বা চাকরি দিয়ে হবে এমনটি নয়। ধরুন, আপনার বন্ধু আপনাকে একটি চাকরির বিজ্ঞপ্তির খবর দিল, আবার আপনার এক শুভাকাঙ্ক্ষী বড় ভাই আপনার মৌখিক পরীক্ষার আগে কিছু বিশেষ পরামর্শ দিল, চাকরিতে যোগদানের আগে এবং পরে আরেক বন্ধু তার বাড়িতে আপনাকে কয়েক দিন আশ্রয় দিল- এগুলোও এক ধরনের সহযোগিতা। আর এসব সহযোগিতা তখনই পাওয়া যায় যখন অন্যের সাথে ভাল সম্পর্ক বা যোগাযোগ বা সংযোগ থাকে। বন্ধুরা, এ অধ্যায়ে সংযোগ স্থাপনে মানুষের আচরণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৩.১ : সংযোগ স্থাপন ও ক্যারিয়ার
পাঠ-৩.২ : ভাল শ্রোতার বৈশিষ্ট্য এবং ভাল শ্রোতা হওয়ার কৌশল
পাঠ-৩.৩ : উপস্থাপনের দক্ষতা ও বাচনভঙ্গি
পাঠ-৩.৪ : লক্ষ্য নির্ধারণ ও সে অনুযায়ী কাজ করা
পাঠ-৩.৫ : আত্মসমালোচনা, আত্মশুদ্ধি ও অক্ষমতা মেনে নেওয়া
পাঠ-৩.৬ : ইতিবাচক মনোভাবাপন্ন মানুষের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলা
পাঠ-৩.৭ : কর্মে সফলতায় মূল্যবোধ
পাঠ-৩.৮ : সহমর্মিতা,পারস্পারিক নির্ভরশীলতা ও আস্থা স্থাপন
পাঠ-৩.৯ : সময়ানুবর্তিতা, নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধ গঠন
পাঠ-৩.১০ : সততা, নিষ্ঠা ও পেশাগত নৈতিকতা
পাঠ-৩.১১ : ক্যারিয়ার গঠনে প্রযুক্তির গুরুত্ব ও প্রযুক্তিগতদক্ষতা গঠনের উপায়
পাঠ-৩.১২ : ক্যারিয়ার গঠনে গাণিতিক দক্ষতা গঠনের উপায়
পাঠ-৩.১৩ : অনুভূতি, মনোভাব ও আচরণ এবং ক্যারিয়ার গঠনে ব্যক্তিগত আচরণ উন্নয়ন

পাঠ-৩.১ সংযোগ স্থাপন ও ক্যারিয়ার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সংযোগ স্থাপন কী তা বলতে পারবেন;
- সংযোগ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- সংযোগ স্থাপনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারবেন;
- সংযোগ স্থাপন করতে পারবেন।

মানুষ যখন চাকরি চায় অথবা তা পায়, দুই ক্ষেত্রেই পরবর্তী উন্নয়নের প্রসঙ্গটি চলে আসে। চাকরি যদি চায় তাহলে নিজেকে সেজন্য প্রস্তুত করে তুলতে হয় এবং চাকরি যদি পায় তবে সেক্ষেত্রে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করা ও পরবর্তী পর্যায়ে উন্নতি করা সব কিছুর জন্যই প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়। ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক স্থাপন এই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার নামান্তর। অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রেই মানুষের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা অত্যাবশ্যক। মানুষ সামাজিক জীব। তার অন্যতম কারণ জীবনে বেঁচে থাকার জন্য প্রতি মুহূর্তে মানুষকে একে অপরের উপর নির্ভর করতে হয়। পেশাগত জীবনে মানুষ ক্ষুদ্র কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠানে অবস্থান ও জীবিকা নির্বাহ করতে শুরু করে। এখানেও প্রতি পদক্ষেপে এবং অগ্রযাত্রায় তাকে পারস্পারিক সম্পর্ক রচনা ও রক্ষা করতে হয়। এভাবে দেখা যায় সামাজিক জীবনের যে স্তরই হোক না কেন পারস্পারিক সংযোগ স্থাপন একটি অন্যতম শর্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যাকে আমরা কোন কারণেই এড়িয়ে যেতে পারি না।

কাজ - এক

নিচের এ কাজটি করলে আপনি অন্য কোন ব্যক্তি বা কোন পরিস্থিতির সাথে কতটা সংযোগ রক্ষা করে চলতে পারেন তা যাচাই করতে পারবেন। নিচের বাক্যগুলোর মধ্যে কোনটি আপনার জন্য প্রযোজ্য টিক (√) চিহ্ন দিন।

আপনি অচেনা কোন ব্যক্তির সাথে সহজেই ভাব জমাতে পারেন।	
যে কোন ব্যক্তির চোখে চোখ রেখে কথা বলতে আপনার অসুবিধা হয় না।	
সহজেই কোন সম্মোধনসূচক শব্দ ব্যবহার করতে পারেন।	
কারও সাথে প্রথম দেখায় তার স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নেন।	
ব্যক্তির পারিবারিক খবর নেয়ার ব্যাপারে উৎসাহ প্রকাশ করেন।	
নিজের প্রয়োজনের কথা সহজেই বলতে পারেন।	
আপনি সব সময় হেসে হেসে কথা বলেন।	
অন্যের দুঃখে দুঃখিত ও আনন্দে আনন্দিত হতে পারেন।	
নিজের প্রয়োজন মেটার পরেও কথা চালিয়ে যেতে পারেন।	
কথা চলার সময় হাতে হাত রাখা বা কাঁধে হাত রাখা আপনার অভ্যাস।	

সংযোগ কী ?

সংযোগ হল একজন ব্যক্তির সাথে অন্য আর একজন ব্যক্তির বা একটি দলের সাথে অন্য আর এক দলের সম্পর্ক গড়ে তোলা। এ ধরনের সম্পর্ক স্থাপনকে আমরা এক কথায় জনসংযোগও বলতে পারি। পেশাগত ক্ষেত্রে এ সম্পর্কের মাধ্যমে দুয়ের মধ্যে আদান-প্রদান ঘটে। যেমন, তথ্য বা ভাব বিনিময়, একে অপরকে পেশাগত কোন সাহায্য করা বা পেশাগত কোন উপাদান বিনিময় ইত্যাদি। এর ফলে দুইজন বা বহু ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্কের জাল বিন্যস্ত হয়। অর্থাৎ নির্দিষ্ট কোন

ক্ষেত্রে পারস্পারিক সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে একটি সুষম ব্যবস্থা তৈরি হয় যেখানে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী পরস্পরের উপর নির্ভর করে ও নিশ্চিন্তে অবস্থান করে।

পারস্পারিক সংযোগের প্রয়োজনীয়তা

সাধারণত ব্যক্তি বা দলের স্বার্থে পারস্পারিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তবে ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির বা দলের অথবা দলের সাথে দলের বা ব্যক্তির সম্পর্ক গড়ে ওঠার পিছনে নানাবিধ কারণ রয়েছে। আসুন এসব কারণের মধ্যে পেশাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কারণসমূহ কী তা দেখি।

- **চাকরি খোঁজা ও পাওয়ার জন্য:** একজন ব্যক্তি যখন চাকরি পাওয়ার ইচ্ছা রাখে তখন তাকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে হয়। বিশেষ করে ব্যক্তির যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুযায়ী সুবিধাজনক চাকরি কোথায় আছে তা জানতে হলে প্রতিষ্ঠানে কোন শূন্য পদ আছে কিনা তা খোঁজ করতে হয়। অথবা সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ব্যক্তি এ ধরনের শূন্য পদের সন্ধান পেতে পারে। তবে আপনি যদি এ পদ সম্পর্কে জানতে চান আপনাকে জনসংযোগের আশ্রয় নিতে হবে। আবার চাকরি পাওয়ার জন্য ঐ পদের প্রয়োজনীয় চাহিদা ও যোগ্যতা সম্মন্ধে খোঁজখবর করতে এক বা একাধিক ব্যক্তির সাথে সংযোগ স্থাপন করতে হয়।
- **চাকরি সম্বন্ধে খোঁজখবর করার জন্য:** পূর্বেই বলেছি নিজেকে কোন শূন্য পদের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য সেই পদ সম্পর্কে খোঁজখবর করতে হয়। এজন্য ঐ প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে সংযোগ স্থাপন করা প্রয়োজন। সংযোগ স্থাপনের সাহায্যে শুধু নিজেকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলা যায় তা নয়; রবং নিজের ভিতরে ঐসব যোগ্যতা কতটা আছে তা বোঝা যায়। ফলে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায় এবং পূর্ণ উদ্যোম নিয়ে চাকরি পাওয়ার পথে এগিয়ে যাওয়া যায়।
- **চাকরিক্ষেত্রে উৎকর্ষ ও উন্নতিলাভের জন্য:** চাকরি পাওয়ার পর ঐ পদে উৎকর্ষ লাভ করার জন্য আপনাকে নিয়ত চেষ্টা করতে হবে। এর জন্য প্রতিষ্ঠানের নিচু পদ থেকে উঁচু পদ সকল ব্যক্তিবর্গের সাথে সংযোগ রক্ষা করতে হবে। এই পদের বা এর থেকে উঁচু পদের যোগ্য হয়ে উঠতে কী কী দক্ষতা অর্জন করা প্রয়োজন, কী ধরনের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন এবং কোন কোন দ্রব্যসামগ্রী দরকার হবে তা জানার জন্য অবশ্যই জনসংযোগ রক্ষা করে চলতে হয়। এমনকি এর জন্য কোন এক বা একাধিক ব্যক্তির সাহায্য ও সহযোগিতা প্রয়োজন হলে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে তা লাভ করা যায়। আবার নিজের উন্নতির জন্য অনেক সময় ভিন্ন কোন প্রতিষ্ঠানের সাহায্যও প্রয়োজন হতে পারে। সে ক্ষেত্রেও জনসংযোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সংযোগ স্থাপনের পূর্বে কী ধরনের প্রস্তুতি প্রয়োজন ?

আপনি যদি কোন ব্যক্তি বা দলের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে চান তাহলে পূর্বে আত্মানুসন্ধান করতে হবে। এটি একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। আত্মানুসন্ধানের ফলে নিজেকে জানা যায় এবং নিজেকে মূল্যায়ন করে আত্মনির্ভরশীল হওয়া যায়। অন্যের সাথে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান ও গুণাগুণ আপনার মধ্যে আছে কিনা তা জানার জন্য যেসব পদক্ষেপ আপনাকে অনুসরণ করতে হবে তা হল ঃ

- **আত্মপ্রতিফলন:** নিজের ভিতর কী ধরনের গুণাগুণ আছে তা যাচাই-বাছাই করে সামনে আনাই এ পদক্ষেপের প্রাথমিক কাজ। এর ফলে নির্দিষ্ট পদের জন্য আপনি কতটা যোগ্য তা বুঝতে পারবেন এবং সেইমত নিজেকে প্রস্তুত করতে পারবেন।
- **আপনি কী জানতে চান:** নির্দিষ্ট পদের জন্য আবেদন করতে বা প্রতিযোগিতা করতে আপনাকে কী কী বিষয় সম্মন্ধে জানতে হবে সে সম্পর্কে আপনাকে স্থির সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বিষয়সমূহ সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানতে পারলেই আপনার পক্ষে প্রস্তুতি নেয়া অনেক সহজ হবে।
- **শক্তিশালী দিক:** আপনার ভিতর যা আছে তার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী কোনটি তা খুঁজে বের করুন। এটির উপস্থিতি ও চর্চা আপনাকে আত্মমর্যাদাশীল ও আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে সাহায্য করবে।
- **প্রস্তুতি:** নিজেকে প্রস্তুত করতে হলে পর্যাপ্ত সময় দিন এবং নিজের প্রয়োজনসমূহ খুঁজে বের করতে মনোযোগী হন।

- **চিহ্নিত করুন:** সংযোগ স্থাপনের পূর্বে কার সাথে সংযোগ স্থাপন করতে হবে এবং কীভাবে তা করতে হবে স্থির করুন। আপনার সামর্থ্য ও যোগ্যতা সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিত হলে সংযোগ স্থাপন সহজ হবে।

কীভাবে সংযোগ স্থাপন করা যায় ?

সংযোগ স্থাপন করতে আপনি বিভিন্ন প্রকার মাধ্যম ব্যবহার করতে পারেন। তবে আপনার ইচ্ছাই সব থেকে বড় কথা। অর্থাৎ যে ব্যক্তি বা দল তার নিজ বা দলের প্রয়োজনে অন্যের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে চায় তাকে নিজ থেকে উদ্যোগী হয়ে স্থির করতে হবে কোন কারণে সংযোগ স্থাপন করা দরকার এবং কী প্রকারে তা করা সম্ভব। সংযোগ স্থাপনের বিভিন্ন মাধ্যম আছে। যেমন:

- **সাক্ষাৎ করা:** এক বা একাধিক ব্যক্তির সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ করে সম্পর্ক স্থাপন করা যায়। এটি একটি শক্তিশালী মাধ্যম। কারণ ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সরাসরি দেখা হলে উভয়ের চাক্ষুস মিলন হয় এবং সেইসাথে দুজনের কাছে দুজনের অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটে। ফলে তারা একে অপরের মনের ভাব বা ইচ্ছা সম্পূর্ণ জানতে পারে। সম্পর্ক অনেক দৃঢ় হয়।
- **দূরালাপনী বা ফোন করা:** সম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছে নিয়ে একজন অপর জনের সাথে ফোনে কথা বলতে পারে। এ ব্যবস্থার সুবিধা এই যে, ব্যক্তি স্থানচ্যুত না হয়ে নিজের জায়গায় বসেই কথা বলতে পারেন। এতে সময়ও অনেক কম লাগে। তবে দীর্ঘ আলোচনার জন্য দূরালাপনী ব্যবস্থা তেমন সুবিধাজনক নয়।
- **চিঠিপত্রের মাধ্যমে:** সংযোগ স্থাপনের জন্য চিঠিপত্র বিনিময়ও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। চিঠি পোস্ট করে, কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে বা ব্যক্তির হাতে প্রেরণ করা যায়। চিঠিতে বক্তব্যের ভাব অনেক বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করা যায় বটে তবে এ ব্যবস্থা অনেক সময় সাপেক্ষ। ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির দূরত্ব যদি কম হয় তবে হাতে হাতে চিঠি পাঠান একটি উত্তম ব্যবস্থা।
- **ই-মেইল করে:** ই-মেইল সংযোগ স্থাপনের জন্য এক ধরনের ইলেকট্রনিক মেইল প্রক্রিয়া। ১৯৯৩ সাল থেকে এ প্রক্রিয়ার প্রচলন হয়েছে। এ ব্যবস্থায় একজন প্রেরক ও এক বা একাধিক গ্রাহকের মধ্যে ডিজিটাল তথ্যের আদান-প্রদান ঘটে। আধুনিক ই-মেইল প্রক্রিয়ায় তথ্য ইন্টারনেট মাধ্যমে চলাচল করে। এ প্রক্রিয়ায় আপনি যদি কোথাও ই-মেইল পাঠাতে চান তবে প্রথমে আপনার তথ্য টাইপ করে কম্পিউটারে লিখতে হবে এবং নির্দিষ্ট ঠিকানায় পাঠাতে হবে। এ তথ্য ইন্টানেটের মাধ্যমে গ্রাহকের ঠিকানায় সংরক্ষিত হয়। গ্রাহক তার সুবিধামত সময়ে নিজ একাউন্ট খুলে এ তথ্য পড়তে পারেন এবং একই প্রক্রিয়ায় প্রেরকের কাছে তার উত্তর পাঠাতে পারেন।

কাজ - দুই

চাকরি ক্ষেত্রে আপনার অবস্থান ও আপনার যোগ্যতা এ দুয়ের অসামঞ্জস্যের প্রতি অসন্তুস্টি জানিয়ে আপনার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে একটি চিঠি লিখুন।

অথবা আপনার যোগ্যতার বিচারে কোন প্রতিষ্ঠানে শূন্য পদে আপনাকে বহাল করার আবেদন জানিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে একটি পত্র লিখুন।

সারসংক্ষেপ

পেশাগত জীবনে প্রবেশ থেকে শুরু করে ক্রমশ: উত্তরণ পর্যন্ত সবক্ষেত্রেই সংযোগ স্থাপন একটি অত্যাবশ্যকীয় প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ার জন্য নিজেকে গড়ে তুলতে হয় এবং সারাজীবন প্রয়োজনীয় গুণাবলির অনুশীলন করতে হয়। সংযোগ স্থাপন একটি অবিরত প্রক্রিয়া। ব্যক্তি কোন এক সময় তার নিজ প্রয়োজনে সংযোগ স্থাপন করল এবং পরবর্তীতে সে সম্পর্কের কোন খোঁজখবর করল না, এমন হলে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। পুণরায় সংযোগ স্থাপন করা খুবই দূরূহ কাজ। বিশেষ কিছু গুণাগুণের মাধ্যমে সংযোগ রক্ষা চলমান করতে হয়। এসব গুণাবলি হল,

- বিনয়ী হওয়া

- ভাষাগত কৌশল রপ্ত করা
- আকর্ষণীয় ভাবমূর্তি গঠন করা
- সৌজন্যমূলক আচরণ করা
- সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে উৎসাহী হওয়া।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সংযোগ স্থাপনের মধ্য দিয়ে কোনটির আদান প্রদান ঘটে?

ক. বিষয়-আসয় খ. আনন্দ-বেদনা
গ. মনের ভাব ঘ. গোপন তথ্য।

২। সংযোগ স্থাপনের জন্য কোনটি শক্তিশালী মাধ্যম ?

ক. ই-মেইল খ. চিঠিপত্র
গ. দূরালাপনী ঘ. সাক্ষাৎ

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। আত্মপ্রতিফলন কী ? এর ফলে কীভাবে সংযোগ স্থাপন সম্ভব?
২। চাকরি ক্ষেত্রে উন্নতিলাভের জন্য একজন ব্যক্তি কীভাবে সংযোগ স্থাপন করবে?

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১ : ১. গ ২. ঘ

পাঠ-৩.২ ভাল শ্রোতার বৈশিষ্ট্য এবং ভাল শ্রোতা হওয়ার কৌশল

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ভাল শোনা কী তা বলতে পারবেন।
- ভাল শ্রোতার গুণাগুণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- ভাল শ্রোতা হতে পারবেন।

আমরা যখন কোন বিষয় নিয়ে কিছু শুনি তখন বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা করতে পারি। অর্থাৎ বিষয়টি সম্পর্কে মনে একটি ভাব তৈরি হয়। ঐ ভাব দিয়ে পরে ভাষার মাধ্যমে আমরা তা প্রকাশ করি। শোনার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে ভাষার অগ্রযাত্রা। কোন কিছু জানতে হলে প্রথমে তা শুনতে হয়। সুতরাং সঠিকভাবে শোনার গুরুত্ব অত্যাধিক। দৈনন্দিন জীবনে চলতে ফিরতে সব সময়ই আমরা কিছু না কিছু শুনছি। তাই শোনার অভ্যাস আমাদের সর্বাপেক্ষা বেশি। কিন্তু সাধারণভাবে যা শুনি তার অধিকাংশই মনে রাখতে পারি না কারণ তা মন লাগিয়ে শুনি না। কিন্তু যে বক্তব্য আমাদের প্রয়োজন, যা আমাদের সমস্যার সমাধান করবে বা জীবন পথে চলতে সাহায্য করবে তা মনে রাখার জন্য মন লাগিয়ে শুনতে হয়। এই মন লাগিয়ে শোনার অভ্যাসটি সহজে গড়ে ওঠে না। অনুশীলন করতে হয়। শিশুকাল থেকে অনুশীলন করলে শোনার অভ্যাস গড়ে ওঠে এবং একজন ভাল শ্রোতা হওয়া যায়।

কাজ - এক

নিচের এই কাজটি করে আপনি আপনার শোনার দক্ষতা যাচাই করতে পারবেন। আপনার পার্শবর্তী কোন বন্ধুকে নিচের লেখা অংশটি একবার পড়তে বলবেন এবং আপনি মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। বন্ধুর পড়া শেষ হলে নিচে ছকে শূন্য ঘরগুলো পূরণ করবেন।

মায়া দেশ বিদেশ মিলিয়ে অনেক জায়গায় ঘুরেছে। তার বন্ধু ডলির সাথে সে বিভিন্ন জায়গায় গেছে। তারা একসাথে ২০০৫ সালে ভারত যায়। সাত দিনের এই ভ্রমণে তারা ভারতের মুম্বাই ও গোয়া ঘুরে দেখে এসেছে। এরপর দুই বছরের মাথায় মায়া লন্ডন যাওয়ার সুযোগ পায়। লীড্‌স বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে মায়া স্বরচিত একটি গবেষণাপত্র পড়ে শুনিয়েছিল। দেশের ভিতর মায়া ১৯৯৫ সালে মামার সাথে বান্দরবান যায়। তখন ওর বয়স আঠারো বছর। এইচ.এস.সি পরীক্ষা দেয়ার পর এই ভ্রমণের সুযোগ এল। ২০১০ সালে পরিবারের সাথে সে সুন্দরবন বেড়াতে যায়। ঐ বছরেই জুন মাসে বোনের বিয়ে উপলক্ষ্যে ফরিদপুরের একটি গ্রাম কুসুমপুরে সে পাঁচ দিনের জন্য বেড়াতে যায়।

বৎসর	স্থান	উপলক্ষ্য	সহযাত্রী
১৯৯৫			
	সুন্দরবন		
		বোনের বিয়ে	

উত্তম শ্রবণ কী?

সাধারণভাবে শ্রবণ শব্দটিকে আমরা সাধু ভাষায় ব্যবহার করি। এর চলিত রূপ হল শোনা। শোনা কাজটি নেহায়েতই দৈহিক। আমাদের যে পঞ্চ ইন্দ্রিয় আছে তার মধ্যে কান একটি । আমরা কান দিয়ে শুনি। তবে আপনি যদি কোন সমস্যা নিয়ে একজন বক্তার কাছে যান এবং বক্তা যদি কিছু বলেন তবে শুধুই কান দিয়ে শুনলেই চলবে না, তাতে মন লাগাতে হবে। অর্থাৎ মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে। শোনা কথাটিকে আমরা বিভিন্নভাবে ব্যবহার করি। যথা:

— আমরা যখন শুধুই কান দিয়ে শুনি এবং পরে তা ভুলে যাই বা স্মৃতি থেকে হুবহু স্মরণ করে বলতে পারি তখন তাকে আমরা শোনা বলি।

— আমরা কোন কিছু শোনার সময় আশেপাশের অন্যসব কিছু তুচ্ছ করে শুনি এবং তার মর্ম উদ্ধার করতে সক্ষম হই তখন তাকে আমরা মনোযোগ দিয়ে শোনা বা লক্ষ করা বলি।

ব্যক্তি যখন মনোযোগ দিয়ে কোন কিছু শোনে তখন তাকে তার তিনটি দক্ষতা প্রয়োগ করতে হয়–

- আগ্রহ (interest)
- মনোযোগ (attention)
- সমন্বয় (adjustment)

ভাল শ্রোতা

আপনি যদি আধুনিক ও সৃজনশীল একজন মানুষ হতে চান তবে একজন ভাল শ্রোতা হওয়া আবশ্যক। কারণ ভাল শ্রোতা তথ্যসমৃদ্ধ হন এবং এমন একজন ব্যক্তি যে কাজেই হাত দেন সেখানেই সফল হন। একজন ভাল শ্রোতা বক্তার বক্তব্য শোনার সময় তার মুখনিসৃত কথা, হাতের সঞ্চালন ও তার মৌখিক অভিব্যক্তি, বিশেষ করে চোখের ভাষার প্রতি মনোযোগী হন। যে কোন ব্যক্তি এবং তিনি যাই বলুন না কেন, আপনাকে ধৈর্য্য ধরে ও মনোযোগ দিয়ে শোনার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। আপনি যখন তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন, তিনি সম্মানিত বোধ করবেন। সেইসাথে তিনি যে বিষয়েই প্রশ্ন করুন না কেন তা উত্তর দিতে আপনিও প্রস্তুত থাকতে পারেন। কারণ তিনি যা বলেছেন আপনি তা মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন।

দেখা যায় বক্তার সাথে একজন ভাল শ্রোতার একটি সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়। বক্তা যখন কিছু বলেন, তখন শ্রোতা হিসেবে আপনি যদি শুনতে কোন অসুবিধা বোধ করেন তবে অবশ্যই প্রশ্ন করবেন। এমন প্রশ্ন যা বক্তার বক্তব্যের বিষয় সংশ্লিষ্ট। বক্তা সে প্রশ্নের উত্তর দিতে আগ্রহ বোধ করেন। এভাবে বক্তার মুখনিসৃত কথা যে আপনি শুধু শোনেন তা তো নয়, সে কথা আপনি অনুধাবন করেন। পরে আপনি যখন কিছু বলবেন তখন স্বাভাবিকভাবে আপনার কথা তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনবেন এবং নিজেকে একজন নিষ্ঠাবান শ্রোতার ভূমিকায় অবতীর্ণ করবেন।

ভাল শ্রোতার বৈশিষ্ট্য

সাধারণত আমরা নিজ প্রয়োজনেই একজন বক্তার কাছে যাই কিছু শুনতে। আমরা প্রশ্ন করি, তিনি উত্তর দেন। এ ক্ষেত্রে তিনি যা বলছেন তা যদি মনোযোগ দিয়ে শুনি তাহলেই উদ্দেশ্য সফল হবে। এ জন্য আপনাকে উন্নতমানের শ্রোতা হতে হবে। ভাল শ্রোতার কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে। নিচে সেগুলো উল্লেখ করা হল:

১. ভাল শ্রোতা সাধারণত উদার ব্যক্তিত্বের অধিকারী হন। তিনি অন্যের মতামত, পরামর্শ, তার অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা সহজেই গ্রহণ করতে পারেন এবং নিজ প্রয়োজনে তা ব্যবহার করতে উদ্যোগী হন।

২. সাধারণত শ্রোতা কিছু শোনার পর তা তার নিজের মধ্যে আলোড়িত করে বা বিশ্লেষণ করেন। বক্তা যা বলেছেন তা কতটা উদ্দেশ্য পূরণ উপযোগী এবং কতটা শুদ্ধ তা নির্ণয় করার জন্যই উত্তম শ্রোতা একাজ করেন।

৩. ভাল শ্রোতা সহজেই চোখে চোখ রেখে বক্তার দিকে তাকাতে পারেন। তিনি বক্তার মুখভঙ্গি, চোখের ভাষা, বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদির মাধ্যমে বক্তব্যের অর্থ সহজ করেন।

৪. ভাল শ্রোতা দৃঢ় চরিত্রসম্পন্ন হয়। তিনি পোশাক বা শারীরিক বৈশিষ্ট্য এবং কোনরকম বিঘ্নকারী উপাদান যেমন, গরম, শব্দ দূষণ বা পরিবেশজনিত কোন বাধার প্রতি আমলে দেন না। বক্তব্যের মূল বিষয়বস্তু অনুসন্ধানে ব্যস্ত থাকেন।

৫. ভাল শ্রোতা বক্তব্যটি যখন অনুধাবন করেন তখন শুধুই তার ভাষাগত দিকটি গ্রহণ করেন না, বক্তার অনুভূতি ও চিন্তা আত্মস্থ করেন। বক্তার অনুভূতি ও তার নিজস্ব দৃষ্টিকোণ ছাড়া বক্তব্যের মর্ম উপলব্ধি করা কখনই সম্ভব নয়।

৬. উত্তম শ্রোতা শুধু শোনেন না, তিনি নিজের বক্তব্য, এ বিষয়ে তার জিজ্ঞাসা, তার চিন্তা-ভাবনা বা বোধ ইত্যাদি ব্যক্ত করেন। অর্থাৎ বক্তার সঙ্গে তার ভাব বিনিময় ঘটে।

৭. ভাল শ্রোতা বক্তাকে নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করার সুযোগ করে দেন। ফলে শ্রোতা তার নিজ অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণে এক অভিনব পথ খুঁজে পান যা দিয়ে তিনি তার সমস্যার সমাধান করতে পারবেন।
৮. শ্রোতা যদি ভাল করে বক্তার বক্তব্য শোনেন তবে অবশ্যই তার মধ্যে প্রশ্ন জেগে উঠবে। তিনি হবেন কৌতূহলী ও অনুসন্ধিৎসু। অর্থাৎ বক্তা কেন বিষয়টি বললেন, কী অবস্থায় বললেন, এর কোন বিকল্প আছে কিনা ইত্যাদি সম্পর্কে নানাবিধ প্রশ্ন তিনি বক্তাকে করেন। সুতরাং শ্রোতা শুধু শ্রোতাই নন তিনি প্রশ্নকারীও বটে।
৯. শ্রোতা যদি মনোযোগী হন এবং প্রশ্ন করতে থাকেন তবে বক্তা শ্রোতার সমস্যার স্থায়ী সমাধানও অনেক সময় দিতে পারেন।
১০. ভাল শ্রোতা ও বক্তার মধ্যে পারস্পারিক মত বিনিময়ের মাধ্যমে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। ফলে শ্রোতা সহজেই বন্ধু লাভ করেন।
১১. একজন শ্রোতার শোনার অভ্যাস যদি খুব ভাল হয়, তবে তিনি সাধারণভাবে যে কোন বক্তব্য শুনতে আগ্রহী হন এবং বাস্তব জীবনে বিবিধ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার মত উপাদান তিনি পেতে পারেন।

একজন ভাল শ্রোতা হওয়া যায় কীভাবে?

যার ভাল শোনার দক্ষতা আছে সেই ভাল শ্রোতা। ভাল শোনার দক্ষতা অর্জন করতে হলে প্রথমে আপনাকে শুনতে হবে, তারপর যা শুনলেন তা ব্যাখ্যা করতে হবে। তারপর তার মর্ম উপলব্দি করতে হবে এবং সবশেষে তা নিজের অভিজ্ঞতার সাথে মেলাতে হবে। এর ফলে বক্তা যা মুখ দিয়ে বলেছেন এবং যা তার হৃদয় দিয়ে বলতে চেয়েছেন সবকিছুই আপনার বোধগম্য হবে। আপনি যদি ভাল শ্রোতা হতে চান তবে আপনাকে বিশেষ কিছু অবস্থা ও গুণাগুণ অর্জন করতে হবে। সেগুলো নিচে লেখা হোল:

- **বক্তার চোখে চোখ রাখুন -** বক্তব্য শোনার অধিকাংশ সময় বক্তার চোখে চোখ রাখুন। দেখুন তার চোখ কী বলছে। তার মুখের অভিব্যক্তি লক্ষ করুন। আপনি যদি বক্তার দিকে না তাকিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকেন তবে বক্তার মনে হতে পারে আপনি মনোযোগ দিয়ে শুনছেন না, ক্লান্ত বোধ করছেন এবং তার কথা শুনতে আপনার ভাল লাগছে না। তবে মাঝে মাঝে চোখ সরিয়ে নিতে পারেন, তাতে বক্তা সাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন।
- **শোনার জন্য প্রয়োজনীয় অবস্থা তৈরি করুন -** বক্তা যেখানে আছে সেদিকে মুখ করে সুবিধাজনক দূরত্বে বসুন অথবা দাঁড়িয়ে থাকুন। উদ্বিগ্ন হবেন না, শিথিল ভঙ্গিতে থাকবেন। বক্তা যা বলছেন না অথচ অর্থ প্রকাশ করছেন তা অনুধাবন করার চেষ্টা করুন। বক্তার হাত রাখার বা ঘোরানোর ভঙ্গি লক্ষ করুন। প্রয়োজনে সামনে ঝুকুন, সম্মতি বা অসম্মতি প্রকাশ করতে মাথা নাড়ুন। বিশেষ কারণে নিজের হাতের অবস্থানও পরিবর্তন করুন এবং প্রয়োজনে মৃদু হাসুন।
- **বক্তব্যে সাড়া দিন -** বক্তব্যের প্রতি সাড়া দিতে বক্তা যা বলছে তার সারসংক্ষেপ উল্লেখ করুন। সারসংক্ষেপ উল্লেখ করার সময় আপনি আপনার নিজের ভাষা ও অভিব্যক্তি প্রকাশ করুন। বক্তার বক্তব্য শোনার সময় সাধারণত আমরা এভাবে তার প্রতি সাড়া দিয়ে থাকি, যেমন,

  অর্থাৎ আপনি বলতে চাচ্ছেন..........
  অথবা অন্য কথায়.....
  তার মানে এটাই বোঝাতে চাচ্ছেন যে......
  এটাই হয়েছিল?....
  ও আচ্ছা এই......

  আপনার সাড়া পাওয়ার পর বক্তা আপনার বোধগম্যতার মাত্রা বুঝতে পারেন। তখন তিনি তার বক্তব্য আরও সহজ করে বলতে চেষ্টা করেন। এ কারণে আপনার সাড়া দেয়ার ভাষা সঠিক ও অনুভূতিমিশ্রিত হতে হবে।
- **প্রশ্ন করুন -** বক্তব্য যদি দূর্বোধ্য মনে হয় তবে আরও তথ্য জানার জন্য ও বোঝার জন্য প্রশ্ন করুন। প্রশ্ন হবে সরাসরি, সহজ এবং ব্যাখ্যামূলক। আপনার প্রশ্ন আপনাকে বক্তব্যের প্রতি মনোযোগী করে তুলবে এবং বক্তাও আপনার প্রতি আগ্রহী ও মনোযোগী হবেন। বিষয় সংশ্লিষ্ট নতুন ও বিস্তৃত তথ্য পাওয়ার জন্য আপনি উন্মুক্ত প্রশ্ন করতে পারেন। যেমন, ”আপনি ভদ্রলোকের সাথে কথা বলার সময় যে সমস্যায় পড়েছিলেন তার কোন উদাহরণ দিতে পারেন?” তবে হ্যাঁ বা না উত্তর হয় এমন প্রশ্ন বার বার করবেন না, এতে বক্তব্য অহেতুক বিলম্বিত হয়।

- **মন্তব্য করুন এবং প্রশ্নের উত্তর দিন -** কথা বলতে বলতে বক্তা যখন একটু থামেন একই বিষয়ের উপর ইতিবাচক মন্তব্য করতে পারেন। কিন্তু ভিন্ন বিষয়ে কিছু বলবেন না। তাতে বক্তা মনে করতে পারেন যে আপনি শুনছেন না। অথবা বক্তা যদি আপনাকে প্রশ্ন করেন তবে আপনার উত্তর তাকে বুঝতে সাহায্য করবে যে আপনি কতটা মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনছেন। আবার একনাগাড়ে কথা বলার পরিবেশ থেকে কিছুক্ষণের জন্য সরে আসার উদ্দেশ্যে নীরবও থাকতে পারেন। তাতে বক্তা অনেকক্ষেত্রে প্রসন্ন হন।
- **খোলা মন নিয়ে শুনুন -** অনেক সময় বক্তা আপনার প্রিয় পাত্র হতে পারেন, কিন্তু তার কথা শোনার সময় তাকে অন্ধের মত সমর্থন করবেন না। শ্রোতা হিসেবে অবশ্যই আপনাকে নিরপেক্ষ থাকতে হবে। অর্থাৎ তিনি যা বলছেন তার যথার্থ অর্থোদ্ধার করা দরকার। তিনি যা বলছেন এবং যা বলতে চাচ্ছেন তাই শুনুন এবং যা আপনার প্রয়োজন তা গ্রহণ করুন। সেখানে আপনার স্বাতন্ত্র্য যেন বজায় থাকে। আবার অনেক সময় অন্য লোকে বক্তা সম্বন্ধে ভাল বা মন্দ কিছু বলতে পারেন। সে কথায় আপনি বক্তাকে বিচার করবেন না। বক্তার বক্তব্য থেকে আপনি শুধু আপনার প্রয়োজনীয় তথ্যটুকু সংগ্রহ করবেন।

কাজ - দুই

দৈনিক সংবাদপত্র থেকে কোন রচনার কিছু অংশ নিয়ে আপনার বন্ধুকে একবার পড়তে বলুন। পড়া শেষ হলে আপনি পঠিত ঐ অংশের সারাংশ বা ব্যাখ্যা লিখুন।

সারসংক্ষেপ

শোনা ক্রিয়াটি কতগুলো মানসিক ও শারীরিক প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। শরীর ও মনের পারস্পারিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়েই শোনার কাজটি সম্পন্ন হয়। এক্ষেত্রে শব্দ গ্রহণ ও তা নিয়ে চিন্তা এ দুটি প্রক্রিয়ার সমন্বয় ঘটে। যা শুনি তা গ্রহণ করি না অর্থাৎ এটি কেবলই শোনা। আবার যখন মানস প্রক্রিয়া সচল করে তা বুঝি ও বিচার করি তখন অনুধাবন ও উপলব্ধি হয়। এ জন্য বক্তার অঙ্গ সঞ্চালন ও অভিব্যক্তি দেখা দরকার। বক্তা যা মুখে বলেন না, অথচ বলতে চান তা তার ভাবে প্রকাশ পায়। একজন ভাল শ্রোতা অপ্রকাশিত এই বক্তব্যও শুনতে পায়, তবে তা কান দিয়ে না মন দিয়ে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বক্তা সম্মানিত বোধ করেন যখন তিনি–
ক. প্রশ্নের উত্তর পান
খ. শ্রোতাকে মনোযোগী দেখেন
গ. অনেক শ্রোতা পান
ঘ. শ্রোতাকে মাথা নাড়তে দেখেন।

২। ভাল শ্রোতা বক্তার অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণে–
ক. প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পান
খ. পথ চলার দিকনির্দেশনা পান
গ. জানার আগ্রহ নিবৃত্ত করতে পারেন
ঘ. সমস্যার সমাধান করতে পারেন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। শোনার সময় বক্তার অভিব্যক্তির প্রতি মনোযোগী হওয়ার কারণ কী?
২। ভাল শ্রোতা বলতে কী বোঝেন?

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.২ : ১. খ ২. ঘ

পাঠ-৩.৩ উপস্থাপনের দক্ষতা ও বাচনভঙ্গি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

১. উপস্থাপন দক্ষতা কি তা বলতে পারবেন।
২. উপস্থাপন দক্ষতা অর্জনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করত পারবেন।
৩. উত্তম উপস্থাপক এর গুণাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৪. উপস্থাপন দক্ষতা মুল্যায়নের উপায়গুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
৫. বাচনভঙ্গি সুন্দর করার উপায় বর্ণনা করতে পারবেন।

সুন্দর করে কথা বলা একটি আর্ট বা শিল্প। এ কাজটি কেউ ভালোভাবে পারে, কেউ আবার ভালোভাবে পারে না। সুন্দর করে কথা বলার ধরন আয়ত্ত করতে হয়। বারবার অনুশীলনের মাধ্যমে এই সুন্দর করে কথা বলার ধরন রপ্ত করা যায়। কখনো কখনো বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমাদের কথা বলতে হয় বা বক্তৃতা রাখতে হয় বা অনুষ্ঠান পরিচালনাও করতে হয়, এটাকে বলা হয় উপস্থাপনা। আসলে এই উপস্থাপনা যে বা যিনি উত্তমরূপে করতে পারেন তাকে বলা হয় ভালো উপস্থাপক। উপস্থাপনের সময় বাচনভঙ্গি সুন্দর করাও অত্যন্ত জরুরি। এই পাঠে আমরা কীভাবে দক্ষতার সাথে উপস্থাপন করা যায় এবং বাচনভঙ্গি সুন্দর করা যায় সেসব বিষয় নিয়েই আলোচনা করব।

পর্ব-ক ঃ উপস্থাপন দক্ষতা

একক কাজঃ উপস্থাপন দক্ষতা কী নিজে নিজে চিন্তা করে লিখুন।

উপস্থাপন দক্ষতা কী? -- ----- -------------

পর্ব-খঃ উপস্থাপন দক্ষতা অর্জনের গুরুত্ব

জোড়ায় কাজঃ

আপনারা দুইজনে আলোচনা করে উপস্থাপন দক্ষতা অর্জনের গুরুত্ব /প্রয়োজনীতা ক্রমান্বয়ে নিচের ছকে লিখুন।

১.	৭.
২.	৮.
৩.	৯.
৪.	১০.
৫.	১১.
৬.	১২.

উত্তম উপস্থাপকের গুণাবলি

দলগত কাজ

আপনারা ৫/৬ জন মিলে একটি দল তৈরি করুন এবং একজন উত্তম উপস্থাপকের কী কী যোগ্যতা ও গুণ থাকা প্রয়োজন বলে আপনারা মনে করেন তা নিচের ছকে লিখুন।

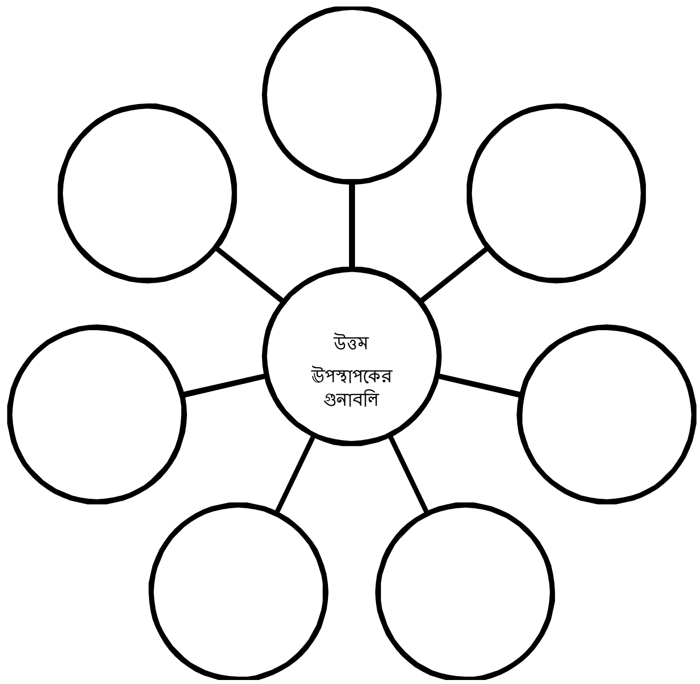

উপস্থাপনের দক্ষতা

পূর্বেই বলা হয়েছে সুন্দর করে কথা বলা একটি আর্ট বা শিল্প। যারা এ কাজটি ভালোভাবে পারেন তারা সর্বত্রই সম্মান পান, সবাই তাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে, মনোযোগ দিয়ে তার কথা শোনে এবং মুগ্ধ হয়। মানুষের এই দক্ষতাকেই উপস্থাপনের দক্ষতা বলা হয়। উপস্থাপনের দক্ষতা হলো প্রমিত উচ্চারণে ও সাবলীলভাবে কথা বলার মাধ্যমে অন্যের সাথে অর্থপূর্ণ যোগাযোগ করা, শ্রোতাগণ যাতে সহজে বুঝতে পারেন। আর এ জন্য সচেতনভাবে প্রতিনিয়ত প্রমিত উচ্চারণে কথা বলার চর্চা অব্যাহত রাখা দরকার। তাছাড়া উপস্থাপনের দক্ষতা অর্জনের জন্য নিম্নোক্ত কৌশলসমূহ অবলম্বন করা দরকার:

১) প্রশ্নের উত্তর বলা;
২) ছবি দেখে বিশ্লেষণ করা;
৩) ছবি দেখে গল্প তৈরি করা;
৪) ধারাবাহিক গল্প বলা;
৫) অন্যের কাছে শোনা এবং গল্প পুণঃ বলা;
৬) নিজের ভাষায় গল্প/ কবিতার মূল বক্তব্য বলা;
৭) কোন বিষয় নিয়ে নিজের মতো করে বলা;
৮) পরিচিত গল্প বা কাহিনী সুন্দরভাবে বলে যাওয়া;
৯) ছড়া/কবিতা আবৃত্তি করা।
১০) যতি চিহ্ন ব্যবহার করে এবং বিষয়বস্তুর ভাবকে অনুধাবন করে জানা এবং ছড়া, কবিতা বা গদ্যধর্মী কোনো পাঠ সম্পর্কে বলা।
১১) জোড়ায় একে অন্যের উপস্থাপনা মূল্যায়ন করা।

১২) ধারা বর্ণনা করা
১৩) উপস্থিত বক্তৃতা দেওয়া
১৪) টেলিফোনে কথোপকথন করা
১৫) দলে কোনো পাঠ ধরে প্রশ্ন-উত্তর করা
১৬) আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বারবার অনুশীলন করা।

ফলপ্রসূ উপস্থাপনের উপায়

- সুন্দর বাচনভঙ্গিতে সহজভাবে উপস্থাপন করতে হবে।
- হাসি মুখে উপস্থাপন করতে হবে।
- প্রয়োজনীয় পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে উপস্থাপন করতে হবে।
- হাস্যরসাত্নবোধ ব্যবহার করতে হবে। তবে সেক্ষেত্রে অবশ্যই পরিমিতবোধ থাকতে হবে।
- উপস্থাপন সহজবোধ্য হবে।
- আলোচিত বিষয়কে ভালোভাবে তুলে ধরতে হবে।
- সংগঠিতভাবে উপস্থাপন করতে হবে।
- কী উদ্দেশ্যে আলোচনা করা হচ্ছে তা সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে।
- উপস্থাপনের বিষয়বস্তু দর্শকের আগ্রহ ও চাহিদাভিত্তিক হতে হবে।
- উপস্থাপন আনন্দায়ক হবে।
- উপস্থাপন পদ্ধতি ও কৌশল সহজ হবে।
- উপস্থাপনের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য দল, জায়গা/ স্থান ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা থাকতে হবে।
- নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপস্থাপন শুরু ও শেষ করতে হবে। প্রয়োজনে এ বিষয়ে পূর্বেই অনুশীলন করে নিতে হবে।
- সঠিক পোশাক পরিধান ও সাজসজ্জা করতে হবে।
- উপস্থাপনের পূর্বে প্রয়োজনীয় অনুশীলন করে নিতে হবে। এতে উপস্থাপনার দক্ষতা বাড়বে। বিষয়বস্তু মুখস্থ করার প্রয়োজন নেই।

এছাড়াও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে নিচের নিয়মগুলো মেনে চলতে হবে:

- নোট থেকে পড়ে পড়ে উপস্থাপন করবেন না।
- দর্শকদের দিকে তাকিয়ে কথা বলবেন, স্লাইড এর সাথে নয়।
- মাইক্রোফোন ব্যবহার করলে সেটি থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে থেকে কথা বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের সাথে দৃষ্টি সংযোগ (eye contact) রক্ষা করবেন, তবে কেবলমাত্র একজন/ দু'জনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবেন না।
- নার্ভাস হবেন না।
- মুখে হাসি রেখে উপস্থাপন করবেন।
- খুব দ্রুত বা অতি ধীরে বক্তব্য উপস্থাপনের অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে।
- আলোচনার শুরুতে নিজের নাতিদীর্ঘ পরিচয় প্রদান করতে হবে এবং আগ্রহের সাথে দর্শনার্থীদের পরিচয় জেনে নিতে হবে যাতে পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরি হয়।

বাচনভঙ্গি

বাচনভঙ্গি বলতে একজন উপস্থাপকের কথা বলার ভঙ্গিমা, বা স্টাইল কে বুঝানো হয়। উপস্থাপন করার সময় তার মুখাবয়ব, মাথা নাড়ানো, হাত নাড়ানোর সঙ্গে পুরো শরীরে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের মুভমেন্ট কে উপস্থাপকের বাচনভঙ্গি বলা হয়ে থাকে। উপস্থাপনার সময় বাচনভঙ্গি সুন্দর করার জন্য নিম্নের বিষয়গুলো মাথায় রাখা প্রয়োজন:

- প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে উপস্থাপন করতে হবে।

- মার্জিত, পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি পোশাক পরিধান করতে হবে।
- ধীরস্থির হতে হবে।
- নার্ভাসনেস ও দুশ্চিন্তা মুক্ত থাকতে হবে।
- পকেটে বা পেছনে হাত রাখা যাবে না।
- সহজবোধ্য মৌখিক অবয়ব থাকতে হবে।
- হাস্য রসাত্মবোধভাব থাকতে হবে।
- দৃষ্টি সংযোগ (eye contact) থাকবে।
- মাইক্রোফোন ব্যবহারে হ্যান্ডসেটটি নির্দিষ্ট দূরত্বে রাখতে হবে।
- মাইক্রোফোন 'ফু' দেয়া যাবে না বরং আঙ্গুল দিয়ে ক্লিক বা টোকা দিয়ে মাইক্রোফোন টেস্ট করা যেতে পারে।

সারসংক্ষেপ

সুন্দর উপস্থাপনা মানুষের একটি গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা। ক্যারিয়ারের বিকাশের জন্য সুন্দর উপস্থাপনের দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি বাচনভঙ্গি সুন্দর করা প্রয়োজন। সুন্দর উপস্থাপনার জন্য ছবি দেখে বিশ্লেষণ করা, ছবি দেখে গল্প তৈরি করা, ধারাবাহিক গল্প বলা, অন্যের কাছে শোনা এবং পুণরায় বলা, নিজের ভাষায় গল্প/ কবিতার মূল বক্তব্য বলা, কোন বিষয় নিয়ে নিজের মতো করে বলা, পরিচিত গল্প বা কাহিনী সুন্দরভাবে বলে যাওয়া, ছড়া/কবিতা আবৃত্তি করা, ধারা বর্ণনা করা ইত্যাদি কৌশল অবলম্বন করা দরকার। বাচনভঙ্গি সুন্দর করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে উপস্থাপন করা, মার্জিত, পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি পোশাক পরিধান করা, উপস্থাপনে ধীরস্থির হওয়া, নার্ভাসনেস ও দুশ্চিন্তা মুক্ত থাকা, পকেটে বা পেছনে হাত না রাখা, সহজবোধ মৌখিক অবয়ব সৃষ্টি করা, হাস্য রসাত্মবোধ ভাব করা, eye contact রাখা, মাইক্রোফোন ব্যবহারে হ্যান্ডসেটটি নির্দিষ্ট দূরত্বে রাখা ইত্যাদি নিয়ম অনুসরণ করা প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোনটি ভাল উপস্থাপকের দক্ষতা?
ক) গম্ভীর থাকা
খ) কঠিন ভাষায় উপস্থাপন করা
গ) দীর্ঘ সময় ধরে উপস্থাপন
ঘ) সুন্দর বাচনভঙ্গিতে সহজভাবে উপস্থাপন করা

২। উপস্থাপনের ক্ষেত্রে কোনটি বর্জনীয়?
ক) খুব দ্রুত বা অতি ধীরে বক্তব্য উপস্থাপন
খ) মুখে হাসি রেখে উপস্থাপন করা
গ) সংগঠিতভাবে উপস্থাপন করা
ঘ) সহজ ভাষায় উপস্থাপন করা

রচনামূলক প্রশ্ন

১. উপস্থাপন দক্ষতা কি তা ব্যাখ্যা করুন।
২. উপস্থাপনে দক্ষতা অর্জনের উপায় বর্ণনা করুন।
৩. ফলপ্রসূ উপস্থাপনের বিবেচ্য বিষয়গুলো আলোকপাত করুন।
৪. বাচনভঙ্গি সুন্দর করার উপায় বর্ণনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৩ : ১। ঘ ২। ক

পাঠ-৩.৪ লক্ষ্য নির্ধারণ ও সে অনুযায়ী কাজ করা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- লক্ষ্য নির্ধারণের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারবেন
- লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারবেন
- লক্ষ্য অনুযায়ী কাজ করতে পারবেন।

আধুনিক বিশ্ব পরিবর্তনের বিশ্ব। চাকরি বা কাজের ক্ষেত্র দিনে দিনে যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনই প্রতিটি ক্ষেত্রে কাজের ধরনও বদলে যাচ্ছে। এখন দ্রুততার যুগ। মানুষ অল্প সময়ের মধ্যে বহুদূর পথ পাড়ি দিতে পারে। পুরান ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন হচ্ছে। আগে মানুষ অল্প যোগ্যতা নিয়ে সুবিধে মত কোন পেশায় প্রবেশ করতে পারত কিন্তু আধুনিক যুগে যে কোন পেশায়ই প্রবেশ করতে চান না কেন আপনাকে অনেক বেশি যোগ্যতাধারী হয়ে উঠতে হবে। একদিকে যেমন প্রয়োজন হয় অনেক বেশি জ্ঞান তেমনই অনেক দক্ষতার প্রয়োজন হয়। এর অন্যতম কারণ হল আধুনিক ও উন্নত দেশগুলোতে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন প্রযুক্তি ও কৌশল উদ্ভাবিত হচ্ছে, নতুন ব্যবসায় ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে, প্রতিষ্ঠানে নতুন নতুন চাহিদা তৈরি হচ্ছে। এসব পরিবর্তনের সাথে আপনি যদি খাপ খাওয়াতে চান তাহলে নিজেকে যোগ্য করতে হবে ও অল্প সময়ে কোন কাজ ভালভাবে করার দক্ষতা অর্জন করতে হবে। তাই মানুষকে খুব তাড়াতাড়ি চিন্তা করতে হচ্ছে কী সে করবে এবং কেমন করে করবে। এসবের জন্য সবার আগে লক্ষ্য নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

কাজ - এক

নিচের ছকটি পূরণ করলে আপনি আপনার অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হবেন। ফলে লক্ষ্য নির্ধারণ করতে বা কী আপনি করতে চাচ্ছেন তা স্থির করতে সুবিধা হবে। প্রতিটি ঘরের প্রশ্ন অনুযায়ী উত্তর লিখুন।

আমি কে ?
আমার শিক্ষাগত যোগ্যতা কি ?
চাকরী বা ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রবেশ করার জন্য আমার কী কী দক্ষতা আছে ?
কি করতে আমি ভালবাসি
বাড়িতে আমি কীভাবে সময় কাটাই
আমি কি আমার অবস্থার পরিবর্তন চাই
সেজন্য আমি কীভাবে চেষ্টা করছি
আমার অবসর সময় কীভাবে কাটে
আমার কিছু গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ কী
ঘরে আমি কি কি দায়িত্ব পালন করি
সমাজের প্রতি আমার কর্তব্য কী

লক্ষ্য নির্ধারণ

মানুষের জীবন কখনও লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যহীন হয়ে চলতে পারে না। যে কোন কাজে হাত দেয়ার আগে লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হয়। লক্ষ্য স্থির না করে কোন কাজ শুরু করলে সহজেই দিকভ্রষ্ট হতে হয়। অর্থাৎ কোন পথে চলতে হবে বা কীভাবে কাজটি করতে হবে মানুষ তা বুঝে উঠতে পারে না। ফলে সম্পূর্ণ কাজটি ব্যর্থতায় পর্যবশিত। তাই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে শেষ করতে চাইলে আগেই লক্ষ্য স্থির করতে হবে। আপনি চাকরি চান বা পদোন্নতি চান যেটাই হোক না কেন আপনার চাহিদা অনুযায়ী পথ চলতে হবে। চাহিদার উপর নির্ভর করে লক্ষ্য নির্ধারণ করুন, লিখুন কী আপনি হতে চান এবং তার জন্য আপনাকে কী করতে হবে । যেমন, আপনি যদি একজন স্কুল শিক্ষক হতে চান। তবে সেটাই হবে আপনার লক্ষ্য। এখন এই লক্ষ্য অর্জন করার জন্য ছোট ছোট উদ্দেশ্য লিখুন।

উদ্দেশ্য ১ - আমি ভালভাবে এস. এস. সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হব।
উদ্দেশ্য ২ - আমি ভালভাবে এইচ. এস. সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হব।
উদ্দেশ্য ৩ - আমি ডিগ্রি পাশ করব।
উদ্দেশ্য ৪ - আমি বি.এড ডিগ্রি নেব ইত্যাদি।

এভাবে একটি একটি করে উদ্দেশ্য পূরণ করে আপনাকে লক্ষ্য অর্জনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। প্রতিটি উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য আপনার সবল দিক ও দুর্বল দিক চিহ্নিত করুন এবং দুর্বল দিকগুলো সবল করে তোলার জন্য অনুশীলন করুন। যেমন, আপনার হাতের লেখা ভাল না বা আপনি মুখস্থ করতে পারেন না ইত্যাদি, এগুলো আপনার দুর্বল দিক। মনে করুন এস.এস.সি. পরীক্ষায় ভাল ফল করার জন্য আপনি আপনার হাতের লেখা ভাল করতে চান। সে জন্য একটি কর্ম পরিকল্পনা করুন।

লিখুন ভাল ও সুন্দর হাতের লেখা অনুকরণের মাধ্যমে আমি আমার হাতের লেখা এক মাসের মধ্যে উন্নত করব। এবার নিচের ছক অনুযায়ী একটি রুটিন তৈরি করুন।

দিন	সময়	
২/৫/১৫	সকাল ৯টাথেকে১০টা পর্যন্ত	সন্ধ্যা৭টা থেকে ৮টা পর্যন্ত
৩/৫/১৫		
৫/৫/১৫		

এখানে নমুনা হিসেবে একটি রুটিনের অংশ দেয়া হল। আপনি আপনার সুবিধা অনুযায়ী রুটিন তৈরি করবেন। যদি চাহিদার পরিবর্তন করতে চান তবে লক্ষ্যেরও পরিবর্তন করুন।

লক্ষ্য নির্ধারণে আত্মমূল্যায়ন

লক্ষ্য নির্ধারণ করার জন্য নিজেকে মূল্যায়ন করুন। শিক্ষাগত ও পেশাগত জীবন পরিকল্পনা ও তা উন্নয়নের জন্য নিজেকে জানা ও বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। নিজের পেশাক্ষেত্রে আপনার পছন্দ, রুচি, আগ্রহ, মূল্যবোধ, আপনার ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী সুবিধা অসুবিধা ইত্যাদি যত বেশি আপনি জানবেন পেশাক্ষেত্র, পড়াশোনা বা প্রশিক্ষণগত প্রধান প্রধান ক্ষেত্র এবং আপনার নিজস্ব চিন্তাচেতনার সাথে শিক্ষার কোন কোন দিকের মিল আছে তত বেশি তা চিহ্নিত করতে পারবেন।

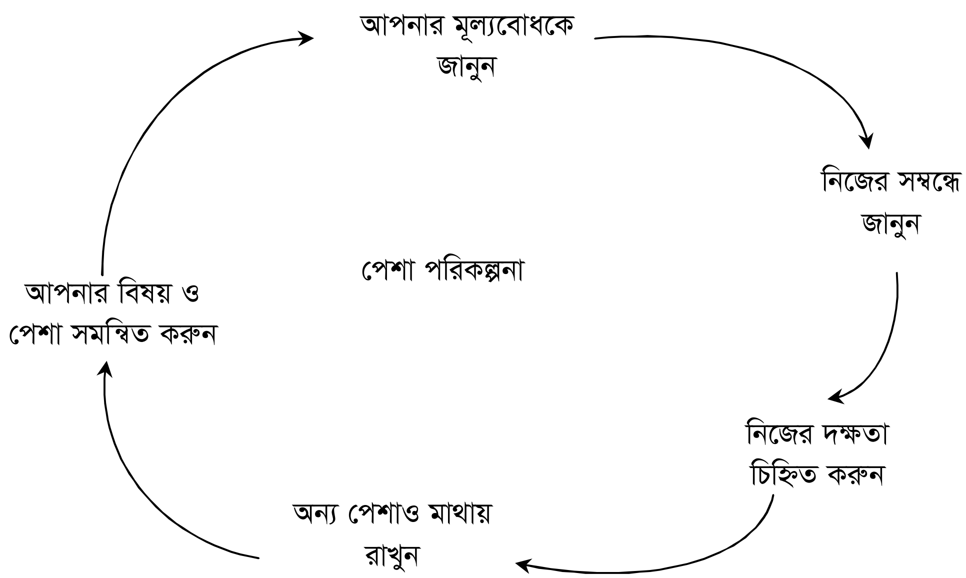

আপনার নিজস্ব গুণাগুণের বহি:প্রকাশ আপনাকে আত্মমূল্যায়ন করতে সহায়তা করে। যেমন:

- যে পেশার প্রতি আপনার আগ্রহ আছে সে পেশা সম্পর্কিত বিভিন্ন কাজ ও দায়িত্ব পালনে আপনি উৎসাহ বোধ করেন।
- কোন নির্দিষ্ট পরিস্থিতি বা ব্যক্তিত্বের প্রতি আপনার প্রতিক্রিয়ার উপর আপনার ব্যক্তিত্ব নির্ভর করে। সেইসাথে কীভাবে আপনি সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন বা কীভাবে আপনি তথ্য সংগঠিত করছেন বা সমস্যার সমাধান করছেন ইত্যাদি সব কিছুর উপর আপনার ব্যক্তিত্ব নির্ভর করে।
- আপনার পছন্দ অপছন্দের উপর নির্ভর করে আপনার মূল্যবোধ। যেমন, আপনি অনেক অর্থ উপার্জন করতে চান এবং মানুষকে সাহায্য করতে চান, আপনি সৃজনশীল হতে চান, শিল্প পছন্দ করেন, নিরাপদ বোধ করবেন এবং নির্ভর করতে পারেন এমন একটি চাকরি আপনি চান ইত্যাদির মাধ্যমে বলা যায় আপনি মানুষটি কেমন।
- আপনার প্রতিভা ও আপনার কর্মক্ষমতা আপনার দক্ষতাকে প্রকাশ করে।
- যেসব কাজ করে আপনি আনন্দ পান অবসর সময়ে সেসব কাজই করেন।

লক্ষ্য নির্বাচনে পেশা ছাড়া অন্যান্য কাজের প্রভাব নিয়ে ভাবুন

সাধারণত পেশাছাড়া প্রতিদিন আপনি অন্যান্য যেসব কাজ করেন, পেশাগত কাজের উপর তার প্রভাব পড়ে। ধরুন আপনি কোন একটি নির্দিষ্ট পেশায় প্রবেশ করবেন বলে প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ব্যক্তিগত জীবনে আপনি একদিকে যেমন একজন পেশাজীবী হবেন, অন্যদিকে তেমনই একজন পিতা ও একজন ছাত্র (কারণ আপনাকে পেশা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে) হয়ে আছেন। আবার আপনি সমাজের একজন প্রতিনিধিও বটে। প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনাকে ভিন্ন ভিন্ন কাজ ও কর্তব্য পালন করতে হয়। সেক্ষেত্রে আপনি প্রধানত একজন পেশাজীবী ও পিতা। কিন্তু বাস্তব জীবনে আপনাকে শুধুই পেশাজীবী ও পিতার ভূমিকা নয় অন্যান্য সকল ক্ষেত্রের কাজের একটি সংমিশ্রণ অনুসরণ করে চলতে হয়। লক্ষ্য নির্ধারণ করার সময় আপনাকে অবশ্যই ভাবতে হবে এসব ক্ষেত্রে আপনার ভূমিকা কী ও কেমন। কোন পেশাগত কাজে এ ভূমিকার প্রভাব কতটা পড়বে এবং সে প্রভাব কী ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। অর্থাৎ জীবনের সমস্ত দায় ও কর্তব্য পালন করার পর যে পেশা আপনি নির্বাচন করতে চলেছেন সেখানে কাজ করার সুযোগ ও সুবিধা কতটুকু পাবেন। তাছাড়া সে পেশার বদৌলতে আপনি যা আয় করবেন তাতে আপনার সামাজিক জীবন নির্বাহ করতে পারবেন কিনা। বাস্তব জীবনে এটি একটি মূখ্য বিষয়।

লক্ষ্য নির্ধারণ অনুযায়ী কাজ করা

লক্ষ্য নির্ধারণ করার পর সে অনুযায়ী কাজ করতে হয় তবেই লক্ষ্য অর্জনের পথে চলা হয়। নিচে এ সংক্রান্ত কাজের বর্ণনা দেয়া হল।

লক্ষ্য বাস্তবায়নে পরিকল্পনা করুন

আপনার পেশাগত জীবন গড়ে তুলতে সর্ব প্রথম আপনাকে পরিকল্পনা করতে হবে । লক্ষ্য অনুযায়ী পথ চলতে আগে পরিকল্পনা করুন। কোন পথে চলবেন, কী করবেন, কখন করবেন, এর ফলে কী পাবেন, এমন কি কোথায় কী পরিমাণ অর্থ ব্যয় হবে তাও পরিকল্পনায় রাখবেন।

পরিকল্পনায় আপনি লিখবেন কীভাবে পেশাগত জীবনে প্রবেশ করতে চান, তার জন্য আপনার কী যোগ্যতা আছে, কী নেই, যা নেই তা আপনি কীভাবে অর্জন করবেন, অর্জন করতে হলে কোথায় যোগযোগ করতে হবে, অর্জন করতে কত সময় প্রয়োজন হবে, কত টাকা ব্যয় হবে, কেন আপনি এই নির্দিষ্ট পেশাটি পছন্দ করছেন (যদি কোন পেশায় প্রবেশ করবেন বলে স্থির করে থাকেন। যেমন আপনি স্থির করেছেন আপনি শিক্ষক হবেন।), আর কোন বিকল্প আছে কিনা ইত্যাদি। পেশাগত পরিকল্পনার কাজটি সম্পূর্ণ আপনার নিজের। কারণ কোন কোন বিষয় এ পরিকল্পনায় থাকবে সে ব্যাপারটি আপনিই ভাল জানেন। এজন্য পরিকল্পনা আপনি নিজে করুন এবং পেশাগত জীবনে প্রবেশের জন্য কী কী শিক্ষাগত ও প্রশিক্ষণগত যোগ্যতা আপনার প্রয়োজন হবে তা পরিকল্পনায় রাখুন।

এ ব্যাপারে একজন পরামর্শদাতা আপনাকে ভাল সাহায্য করতে পারবেন। পরামর্শদাতা বা একজন নির্দেশক আপনাকে যেসব বিষয়ে নির্দেশনা দেবেন তা নিচে লেখা হল

- আপনি কীভাবে পরিকল্পনাটি করবেন সে সম্মন্ধে তিনি বলতে পারবেন।
- যেসব তথ্য আপনার প্রয়োজন তা আপনি কোথায় পাবেন তার নির্দেশনা তিনি দিতে পারবেন।
- কোথাও কোন বাধা আসলে তা কীভাবে লঙ্ঘন করবেন বা পার হবেন সে কথাও তিনি বলতে পারবেন।
- আপনার বর্তমান দীর্ঘ মেয়াদী শিক্ষা ও পাশাপাশি প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ কীভাবে একসাথে বা পৃথকভাবে চালিয়ে যেতে পারবেন তার দিকনির্দেশনা তিনি দিতে পারবেন।

মনে রাখবেন আপনার পেশাগত জীবনে প্রবেশ বা সে জীবন সম্বন্ধে অন্য যে কোন সিদ্ধান্ত সব সময় আপনাকেই নিতে হবে এবং লক্ষ্যে পৌঁছবার সকল উদ্যোগও আপনাকে নিতে হবে। আপনার লক্ষ্যকে সুনিয়ন্ত্রিত রাখা এবং তা সঠিক পথে পরিচালিত করা আপনার দায়িত্ব।

প্রশিক্ষণ

সাধারণভাবে মানসম্মত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যকর ব্যবস্থা। কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ পদের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ব্যক্তিগত, দলীয় বা সমন্বিত উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষক একজন অভিজ্ঞ শিক্ষকের মত। তিনি তার সহকর্মী বা অধস্তনদের উন্নতিতে সহায়তা করেন।
আপনি কোন পেশায় প্রবেশ করতে যাচ্ছেন বা কোন পদের জন্য নিজেকে তৈরি করতে চাচ্ছেন তা আপনি স্থির করেছেন। আভিজ্ঞ পরামর্শদাতা আপনাকে বলতে পারবে আপনার কী কী বা কোন ক্ষেত্রে জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রয়োজন। সে অনুযায়ী আপনি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নির্বাচন করবেন। প্রশিক্ষক আপনার বর্তমান যোগ্যতা কোন ক্ষেত্রে কতটা আছে তা জেনে নেবেন এবং সে অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। অর্থাৎ আপনার জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণ দেবেন। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর আপনি একজন যোগ্য প্রার্থী বলে বিবেচিত হবেন।

পেশাগত ও আনুসঙ্গিক কাজ

পেশাজীবনে প্রবেশ করার পূর্বে সাধারণত আমরা পেশার জন্য মূখ্য ও প্রয়োজনীয় কাজ অনুশীলন করে থাকি। অন্যদিকে পেশাক্ষেত্রে প্রবেশের পরেও যে কোন একটি পদের জন্য প্রয়োজনীয় কাজ করি। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট পেশায় বহু লোক বহু

রকম কাজ করে। নির্দিষ্ট পেশার জন্য প্রস্তুতি নেয়ার সময় ঐসব কাজেও আপনাকে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। সেজন্য সবার আগে লক্ষ্য স্থির করা প্রয়োজন। অর্থাৎ আপনি কোন পেশায় প্রবেশ করতে চান অথবা কোন পেশার অন্তর্ভুক্ত উচ্চতর কোন পদে উন্নীত হতে চান। যেটিই হোক না কেন।

- পারিপার্শিক অবস্থায় বিভিন্ন ধরনের কাজের প্রতি নজর দিতে হবে।
- এক ধরনের দক্ষতা থাকা কখনই কাম্য নয়। ঘুরে ঘুরে প্রতি কাজের প্রতি আপনার আগ্রহ জন্মাতে হবে এবং সেকাজে দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।
- আপনি আপনার ম্যানেজার (ব্যবস্থাপক) বা সুপারভাইজারের (তত্বাবধায়ক) সাথে কথা বলতে পারেন। আপনি তাকে আপনার আগ্রহের কথা জানাতে পারেন।
- অন্য পদে যিনি আছেন তার কাছ থেকে কাজটি শিখতে তার শরণাপন্ন হতে পারেন।
- সর্বোপরি যে যে কাজে দক্ষ আপনার নিজস্ব সময়ে আপনি তার কাছ থেকে সে কাজটি শেখার জন্য সচেষ্ট থাকবেন।

পদের বা অবস্থানের সাময়িক পরিবর্তন

কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন পদে কাজ করেন। পদ অনুযায়ী তাদের কাজের ধরনও ভিন্ন। নিজের যোগ্যতা বৃদ্ধি করতে হলে যে কোন কর্মীকে বিভিন্নমুখী কাজের ধরন জানতে হবে এবং সেসব কাজে দক্ষ হয়ে উঠতে হবে। এজন্য প্রয়োজন ঐসব পদে অবস্থান পরিবর্তন করা। এ পরিবর্তন সাময়িক। শুধুই ঐ পদের কাজের সাথে পরিচিত হওয়া এবং সে কাজে দক্ষতা আনা। তবে নিজে নিজে তো আর পদ পরিবর্তন করা যায় না, সেজন্য কর্তৃপক্ষের অনুমতি লাগে। এমন অবস্থায় আপনি আপনার ম্যানেজার বা সুপারভাইজারকে বলুন যে আপনি কোন নির্দিষ্ট পদের বা একাধিক পদের কাজ শিখতে চান। কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেবেন। এখানে একথা মনে রাখতে হবে যে, পদটি অবশ্যই আপনার পদের সমমানের হতে হবে, উচ্চ কোন পদ হলে চলবে না।

কর্মী হিসেবে আপনি যদি বহু রকম কাজে পারদর্শী হন, বহু গুণে গুণান্বিত হন, তবে প্রতিষ্ঠান আপনাকে সমাদর করবে। কর্তৃপক্ষ আপনাকে মূল্যায়ন করবে। অর্থাৎ আপনাকে আর্থিকভাবে বা অন্য কোনভাবে উপকৃত করবে। অথবা অল্প সময়ে আপনার পদোন্নতি হবে। সুতরাং নিজেকে একজন দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে তুলতে আপনাকে একদিকে যেমন মাথা খাটাতে হবে অন্যদিকে তেমন পরিশ্রমও করতে হবে।

দক্ষতার অনুশীলন

আপনি যে পেশাটি পছন্দ করেছেন তার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা আপনার আছে কিনা তা প্রথমে অনুসন্ধান করুন। যদি না থাকে তবে তা অর্জন করার জন্য আপনাকে চেষ্টা করতে হবে আর যদি থাকে তবে তা অনুশীলনের মাধ্যমে তার মাত্রা আরও বৃদ্ধি করতে হবে। দক্ষতা অনুশীলনের অন্যতম ক্ষেত্র হল প্রশিক্ষণ। যারা এ ধরনের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন তাদের সাথে যোগাযোগ করে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারেন। অন্যদিকে যদি আপনি কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন এমন অবস্থা হয় তবে পদোন্নতির জন্য আপনার সহকর্মীর কাছ থেকে কাজ শিখে নিতে পারেন।

এ প্রসঙ্গে আগেই বলেছি পেশাগত ও আনুসাঙ্গিক কাজ করে, অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্য নিয়ে বা পদের সাময়িক পরিবর্তনের মাধ্যমেও দক্ষতার অনুশীলন করা সম্ভব। প্রশিক্ষণ নিন বা কারও সাহায্য নিন আপনি বার বার যাচাই করবেন আপনার দক্ষতা পুরোপুরি অর্জন হল কিনা। তা না হলে আপনার লক্ষ্য অর্জন হবে না।

অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্য নিন

আপনার উন্নতির পথে একজন অভিজ্ঞ কর্মী বিশ্বস্ততার সাথে ভাল নির্দেশনা দিতে পারেন। চলার পথে ভাল একজন নির্দেশক পাওয়া একটি মূল্যবান সম্পদ পাওয়ার মত। আপনি নিজের চেষ্টায় যতটা না এগিয়ে যেতে পারবেন, একজন অভিজ্ঞ কর্মীর নির্দেশনা আপনাকে অনেক বেশি এগিয়ে নিতে পারে। অবশ্য আপনার কর্মক্ষেত্রে উন্নতির জন্য আপনাকে সঠিক পরামর্শ দেয়ার ব্যাপারে তিনি দায়বদ্ধ। তিনি যে শুধু এ ব্যাপারে আপনাকে জ্ঞান দেবেন তাই নয়, আপনার

কর্মক্ষেত্র কীভাবে আপনাকে সাহায্য করবে ও গ্রহণ করবে সে ব্যাপারেও পরামর্শ দেবেন। সম্ভব হলে যিনি বন্ধুর মত আপনাকে সাহায্য করবেন তার সাথে যোগাযোগ করুন ও পরামর্শ নিন।

কাজ - দুই

উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা ও সে অনুযায়ী কাজ করার জন্য আপনি প্রস্তুত হয়েছেন। এর জন্য প্রথমে আপনি আপনার যে কোন একটি দুর্বলতা অনুসন্ধান করুন এবং সেটি সবল করে তোলার জন্য একটি রুটিন তৈরি করুন। এ ধরনের পরিকল্পনা অনুসরণ করলে আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত পেশা বা পদের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারবেন।

সারসংক্ষেপ

আমরা যে কাজ করার জন্যই ইচ্ছা প্রকাশ করি না কেন তার জন্য আমাদের আগে লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে। পরে সে লক্ষ্য অনুযায়ী এগিয়ে যেতে হবে। লক্ষ্য নির্বাচনের জন্য যেমন সে লক্ষ্য আপনার উপযোগী কিনা তা যাচাই করা প্রয়োজন। কীভাবে তা যাচাই করবেন? সেজন্য আপনি নিজে কোন ধরনের মানুষ তা মূল্যায়ন করুন। যে কাজটি করতে চাচ্ছেন সেটি কী রকম তা দেখুন, এবং সবশেষে লক্ষ্য নির্ধারণ করুন। লক্ষ্যপথে এগিয়ে চলতে বহু রকম কাজের মোকাবেলা করতে হয়। যেমন, সূচনায় পরিকল্পনা করতে হয়, প্রশিক্ষণ নিতে হয়, পেশাগত ও আনুসাঙ্গিক কাজে দক্ষতা অর্জন করতে হয়, দক্ষতা অর্জনের জন্য পদের সাময়িক পরিবর্তন করা যায়, অর্জিত দক্ষতার অনুশীলন করতে হয় এবং সবশেষে কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ নেয়া যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মানুষ কোন কাজের আগে লক্ষ্য নির্ধারণ করে কেন ?

ক. কাজটি সময়ের মধ্যে শেষ করার জন্য
খ. চাকরিতে পদোন্নতি পাওয়ার জন্য
গ. কাজটি ভালভাবে শেষ করার জন্য
ঘ. কাজটির মাধ্যমে ফললাভ করার জন্য।

২। প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা প্রয়োজন কেন ?

ক. ভাল চাকরি পাওয়ার জন্য
খ. চাকরি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য
গ. চাকরিতে উন্নতি করার জন্য
ঘ. একজন ভাল প্রার্থী হওয়ার জন্য।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। লক্ষ্য নির্ধারণে আত্মমূল্যায়নের প্রয়োজন কী?

২। একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি আপনাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারেন ?

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৪ : ১. ক ২. ঘ

পাঠ-৩.৫ আত্মসমালোচনা, আত্মশুদ্ধি ও অক্ষমতা মেনে নেওয়া

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- আত্মসমালোচনা করতে পারবেন।
- নিজে কোন দোষ করলে তা দূর করতে পারবেন।
- নিজের অক্ষমতা মেনে নিতে পারবেন।

পেশাক্ষেত্রে কর্ম পরিচালনায় মানুষ যেসব সময় সফল হবে এমন কথা বলা যায় না। পরিবেশ ও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না থাকলে তার ভুল হতেই পারে। অথবা জগতে সব কাজেই সে দক্ষতার পরিচয় দেবে এমনটিও হয় না। কাজে দুর্বলতা থাকতে পারে। এহেন অবস্থায় মানুষ কাজে ব্যর্থ হয়, হতাশ হয় ও লজ্জাজনক পরিস্থিতিতে পড়ে। মানুষ তখন নিজেকে দোষারোপ করে, নিজেকে ধিক্কার দেয় এবং নিজের দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার জন্য প্রচেষ্টা করে। তবে কোন কোন সময় দুর্বলতা দূর করার পরিবর্তে সে হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এ অবস্থা কখনই কাম্য না।

কাজ - এক

নিচের কাহিনীটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

রকিব মাধ্যমিক স্কুলের একজন গণিত শিক্ষক। একজন সার্থক শিক্ষক হিসেবে তার সুনাম আছে। কারণ তিনি শিক্ষার্থীদের দিয়ে শুধু অঙ্ক করান না তাদেরকে অঙ্কের নিয়মকানুন ভালভাবে শিখিয়ে দেন, যেন তারা নিজেরাই সমস্যার সমাধান করতে পারে। ভাল শিক্ষক হিসেবে যেমন তার সুনাম আছে, তেমনি খুব কড়া শিক্ষক হিসেবে তার বদনামও আছে। ক্লাসে শিক্ষার্থীরা তাকে প্রশ্ন করতে ভয় পায়। কেউ যদি বাড়ির কাজ না করে আনে তিনি তাকে অত্যন্ত কড়া শাস্তি দিয়ে থাকেন। সেদিন একজন ছাত্র ক্লাসে অঙ্ক না করে পাশের ছেলের সাথে গল্প করছিল। রকিব এই দেখে অত্যন্ত রাগান্বিত হন এবং ছেলেটিকে ডেকে একটি চড় মারেন। ছেলেটি ঘুরে বেঞ্চের উপর গিয়ে পড়ে এবং তার মাথার কোণায় কেটে রক্ত বেরিয়ে আসে। পরে ক্লাস ক্যাপটেনের সহযোগিতায় তিনি পরিস্থিতি কিছুটা সামলে নেন।

১. শিক্ষক হিসেবে রকিবের সমস্যা কোথায় ?
২. আপনার কি মনে হয় যে রকিব এ সমস্যার মোকাবেলা করতে পারবে ?
৩. এ সমস্যার মোকাবেলা করতে রকিবের কি করা উচিত বলে আপনি মনে করেন ?
৪. শারীরিক শাস্তি প্রদান যে একটি গুরতর অপরাধ ও অনৈতিক কাজ তা রকিব কীভাবে উপলব্ধি করবে?

আত্মসমালোচনা

আত্মসমালোচনা অর্থ হল নিজের সমালোচনা করা। আমরা যখন আত্মসমালোচনা করি তখন নিজের সাথে কথা বলি। সে কথাগুলো আমাদের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে। কখনও মুখে উচ্চারণ করি কখনও করি না। মনে মনেই বলি। যেমন, আমরা বলি–

"আমি ভাল কিছুই করতে পারি না।",
বা " কী অদ্ভূত লাগছে আমাকে দেখতে!"
বা "কী হয়েছে আমার? আমি কিছুই করতে পারছি না?"

বা "আমি এতই বোকা! এ আমি কী করলাম?" ইত্যাদি। এবার নিশ্চই বুঝতে পারছেন আত্মসমালোচনা আমরা কীভাবে করি। সাধারণত আমরা যখন কোন কাজে ভুল করি বা এমন কাজ করি যা লজ্জাজনক বা আমার অক্ষমতা প্রকাশ করে তখনই আমরা নিজের সমালোচনা করি।

যেমন ধরুন, গণিত বই-এর কোন একটি অধ্যায় থেকে অঙ্ক করার সময় দেখা গেল আপনি একটি অঙ্কও মেলাতে পারছেন না। বার বার চেষ্টা করেও পাছেন না। এ অবস্থায় আপনি কী করবেন? নিজেকে দোষারোপ করবেন তো? এটিই আত্মসমালোচনা।

আমরা কোন কাজে ভুল করি বা ব্যর্থ হই তখনই যখন আমরা কাজটি মনোযোগ দিয়ে করি না, বা নিয়ম না জেনে কাজ করি ইত্যাদি। অথচ নিজের ভুল স্বীকার না করে অনেক সময়ই আমরা অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাই। আত্মসমালোচনা করলে নিজের সাথে নিজের বোঝাপড়া হয়। অর্থাৎ নিজে যে ভুল করেছি তা বুঝতে পারি ও নিজের কাছে স্বীকার করি। আত্মসমালোচনা করলে মানুষ নিজের লজ্জা, দুঃখবোধ, ক্রোধ, হতাশা, নিজেকে দোষারোপ করা এসব নিজের কাছে প্রকাশ করতে পারে।

তবে কঠোরভাবে আত্মসমালোচনা করলে মানুষ নিজেকে ঐভাবেই চিনতে শুরু করে। ফলে তার আত্মশক্তি ও আত্মবিশ্বাস হারিয়ে যায় এবং তার দ্বারা কোন কাজে উন্নতি করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। যারা খুব কঠিনভাবে নিজেকে দোষারোপ করে, যেমন, নাহ্ আমার দ্বারা এ কাজ কিছুতেই হবে না। আমি একটা লক্ষীছাড়া! ইত্যাদি। তারা হতাশ হয়ে পড়ে ও ধীরে ধীরে একা হয়ে যায়।

বেয়ার (Bear) আত্মসমালোচনাকে দু'ভাবে ভাগ করেছেন: গঠনমূলক আত্মসমালোচনা ও অগঠনমূলক আত্মসমালোচনা।

গঠনমূলক আত্মসমালোচনা: এ ধরনের আত্মসমালোচনায় মানুষ কোন কাজ ঠিকমত সম্পন্ন না করতে পারলে সে নিজের ভুল দেখতে পায় এবং কী করলে পরবর্তীতে এ ভুলটি আর হবে না তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। দেখা যায় একজন বিবেচনাসম্পন্ন মানুষ এধরনের আত্মসমালোচনা করেন। ফলে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থ হয় না।

অগঠনমূলক আত্মসমালোচনা: এ ধরনের আত্মসমালোচনায় মানুষ কোন কাজ ঠিকমত সম্পন্ন না করতে পারলে ভুল খুঁজে বের করার পরিবর্তে নিজেকে কঠিনভাবে দোষারোপ করে। নিজের প্রতি সে অন্যায় করে এবং নিজেকে ক্ষতিগ্রস্থ করে।

এবার আসুন দেখি আপনি কী প্রকার আত্মসমালোচনা করেন। আত্মসমালোচনা করার জন্য নিজের চিন্তার প্রতি মনোযোগ দিন এবং নিচের বিষয়গুলো লিখুন।

- প্রতিটি চিন্তা বা ভাবনার সময় ও তারিখ
- আপনার চিন্তাটির উৎপত্তি কোথা থেকে, অর্থাৎ কোন পরিস্থিতিতে আপনি এমন কথা ভাবছেন এবং কী বিষয়ে আপনি আত্মসমালোচনা করছেন। যেমন, ব্যাপারটা কী হচ্ছে বা পরিস্থিতিটা কী? সেটার সাথে আপনার কোন চিন্তা বা কোন অনুভূতি বা আচরণ জড়িত?
- নির্দিষ্টভাবে আপনার আত্মসমালোচনামূলক ভাবনা। অর্থাৎ আপনি নিজেকে কী বলেছেন তা লিখুন।
- নিজেকে সমালোচনা করার পর কী করলেন? আপনি কী শুধুই বলেছেন নাকি নিজেকে আঘাত করেছেন? অথবা নিজের দোষটি ঢাকবার জন্য অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়েছেন।
- ঘটনাটি ঘটার সময় যে আপনার সাথে ছিল এমন কোন বন্ধু বা সহকর্মীকে এ ব্যাপারে আপনি কী বলেছেন।

উপরের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখেছেন? এবার ভাবুন আপনার উদ্দেশ্য কী ? লক্ষ্যে পৌঁছানো। তাইতো? তাহলে উত্তরগুলো পড়ে দেখুন তো আপনি কী নিজের প্রতি সুবিচার করেছেন? নাকি নিজেকে নির্দয়ভাবে দোষারোপ করেছেন যাতে আপনার মনোবল ভেঙে পড়ে, কাজে আর এগোনো যাবে না? অথবা নিজের কোন ত্রুটি না দেখে পরিবেশ বা তার কোন উপাদান বা অন্য কারও উপর দোষ চাপিয়ে দিয়েছেন। না একাজ করলে কখনই আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছোনো সম্ভব হবে না। আপনি জানেন এটি একটি অপরাধমূলক কাজ।

যদি সুবিচার করে থাকেন তবে গঠনমূলক সমালোচনা হয়েছে এবং নিজের দোষত্রুটি আপনার নিজের কাছেই ধরা পড়বে। আপনি সেগুলো শোধরানোর চেষ্টা করবেন এবং তখন আপনি দেখবেন যে, আপনি একজন সুখী মানুষ। নিজেকে আপনি ভালবাসেন। আপনি এক সময় ঠিকই লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবেন।

সুতরাং অগঠনমূলক সমালোচনা আমরা নিজের প্রতি করব না এবং এমন কথা কখনও নিজেকে বলব না যা আমাকে হতাশ করে দেবে, আমার দ্বারা আর কোন কাজ করা সম্ভব হবে না।

আত্মশুদ্ধি

নিজের দোষ বা ক্রটি নিজের কাছে ধরা পড়ার পর সেগুলো শোধরানোর বিষয়টি এসে পড়ে। এ শোধরানোকে আত্মশুদ্ধি বলে। আমরা যখন এমন কোন কাজ করি বা এমন কোন আচরণ করি যার জন্য নিজেকে দোষী মনে হয়, তখন নিজের কাছে নিজে দুঃখ প্রকাশ করি এবং আর কখনও এ রকম কাজ না করার জন্য নিজের কাছে নিজে প্রতিজ্ঞা করি। একে বলে দোষ স্বীকার করা এবং নিজে নিজে শোধরান বা আত্মশুদ্ধি। এ অবস্থায় আমরা মানসিকভাবে দুঃখিত হয়ে পড়ি। এই দুঃখবোধই আমাদের এমন কাজ করতে অনুপ্রেরণা দেয় যাতে আর ভুল হওয়ার বা নতুন কোন দোষে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে না। মনের এই অবস্থা আমাদের নতুন পথ দেখায়, যে পথে কাজটি ভালভাবে সম্পন্ন হবে।
যেমন, কোন অঙ্ক যদি না মেলাতে পারেন তবে আপনি কী করবেন? নিজেকে দোষ দিয়ে চুপ করে বসে থাকবেন ? নিশ্চয়ই না। বরং কী করবেন আপনি তা ভাবুন এবং খাতায় লিখুন।

তবে মানুষ যদি শোধরানোর পরিবেশ না পায় সে তার দুঃখবোধ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না এবং মানসিক চাপে সে অবসাদগ্রস্থ হয়। অর্থাৎ তার মন ভেঙে যায়।

আত্মশুদ্ধির কার্যকারিতা

দেখা যায়, অধিকাংশ মানুষ ভুল বা অন্যায় করার জন্য নিজের ইচ্ছায় দুঃখ প্রকাশ করে। আত্মশুদ্ধি এক ধরনের নেতিবাচক অনুভূতি। এখানে মানুষ আগে কোন অন্যায় বা ভুল কাজ করে এবং পরে সে এ কাজ বা আচরণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে। এ অনুভূতির পাঁচটি বিশেষ কার্যকারিতা আছে।

১. দুঃখজনক এই পরিস্থিতি মানুষের ভিতর আত্মপলোদ্ধির জন্ম দেয়। সে নিজের অবস্থা বুঝতে পারে এবং এ অবস্থা থেকে সে কী করে বেরিয়ে আসবে অনেক সময় সে বোধও তার ভিতর জন্ম নেয়।
২. ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ সে আর করবে না বলে নিজের কাছে নিজে প্রতিজ্ঞা করে। ফলে দেখা যায় তার ভবিষ্যৎ আচরণ সম্বন্ধে সে সচেতন হয়ে যায়। যার কারণে ভবিষ্যতে তার কাজের মাধ্যমে জীবন যাপন অনেক সুন্দর হয়ে যায়।
৩. আত্মশুদ্ধির ফলে মানুষের ভিতর অন্তদর্শন জন্ম নেয়। নিজেকে সে চিনতে পারে এবং ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে তৈরি করার ব্যাপারে সে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে উদ্যোগী হয়।
৪. সমাজের সাথে সে এক ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায়। নিজেকে যদি একজন শুদ্ধ ব্যক্তি হিসেবে তৈরি করতে হয় তবে সমাজের মাঝেই তা করা সম্ভব। নিজেকে সমাজের মাঝে ফেলে দেখতে হয় আমি কতটা যোগ্য হয়েছি।
৫. মানুষ তার নিজ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। কারণ ভবিষ্যৎ পরিস্থিতিতে সে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর জন্য তার এ ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজন আছে। ভবিষ্যতে সে যে সব সুযোগ লাভ করবে সেগুলোকে যথাযথ ব্যবহার করার জন্য তার অতিরিক্ত ক্ষমতার প্রয়োজন হবে।

অক্ষমতাকে মেনে নেয়া

মানুষ যখন কোন কাজ করতে অপারগতা প্রকাশ করে, অর্থাৎ সে বলে যে "এ কাজটি আমি করতে পারব না" অথবা কোন কাজ করে সে ব্যর্থ হয়, অর্থাৎ কাজটি তার দ্বারা সঠিকভাবে সম্পন্ন হয় না তখন ঐ ব্যক্তিকে ঐ কাজের জন্য অক্ষম হিসেবে ধরা হয়। একজন মানুষ জগতে সব কাজ করতে পারবে এটি কখনই সম্ভব না। পৃথিবীতে কোন কোন কাজ থাকবে যা সে করতে অক্ষম হবে। একজন সুস্থ দেহ ও সুস্থ মনসম্পন্ন মানুষের জন্যও এ কথাটি সত্য। যেমন, আমাদের দেশে অনেক মানুষ আছে যারা পড়তে পারে না। এর অন্যতম কারণ হল তারা পড়তে শেখেনি। অল্পকিছু সংখ্যক মানুষ আছে যারা অন্ধ, সে কারণে তারা পড়তে পারে না। যে কারণটি হোক না কেন পড়তে না পারা তার অক্ষমতা। আবার অনেক মানুষ আছে যারা অন্য মানুষের সাথে খুব সহজে মিশতে পারে না। অন্তর্মুখী বা নিজেদের নিয়েই থাকতে পছন্দ করে। এমন ধরনের মানুষই সহজে মানুষের সাথে মিশতে পারে না। মানুষের এ ধরনের ব্যর্থতাকে অক্ষমতা বলা হয়।

সাধারণভাবে মানুষ কোন কাজে তার অক্ষমতাকে গ্রহণ বা স্বীকার করতে পারে না। কারণ সে ঐ কাজের জন্য নিজেকে যোগ্য করে তুলতে চেষ্টা করে। কিন্তু তার প্রকৃতি বা তার স্বভাব বা কোন অঙ্গহানি তাকে ঐ কাজে যোগ্য হতে বাধা দেয়। ফলে তার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সে ঐ কাজটি করতে ব্যর্থ হয়। এ কারণে অক্ষমতা সব সময় মানুষের নিজের ইচ্ছেয় ঘটে না। অনেক সময় সে অক্ষমতাকে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও লঙ্ঘণ বা অবহেলা করতে পারে না। এমন অবস্থায় অক্ষমতা তাকে মেনে নিতে হয়। দেখা যায় অক্ষমতার কারণে সে কোন কাজে হাত দিতে পারে না অথবা কাজটি করে সে সফল হতে পারে না। তখন তার এ অক্ষতাকে মেনে নেয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না।

অক্ষতাকে মেনে নেয়া

অনেকেই মনে করেন অক্ষমতা মেনে নেয়া যায় না বরং তা শোধরাতে হয়। কিন্তু যদি শোধরানো না যায় তবে? যেমন, যিনি অন্ধ, পড়তে পারেন না, তার জন্য সে অক্ষমতা মেনে নেয়া ছাড়া উপায় কী? এ কারণে অক্ষমতা যখন মানুষের নিজের ইচ্ছেয় ঘটে না তখন তা মেনে নিতে হয়। তবে সবক্ষেত্রে অক্ষমতা মেনে নেয়া যায় না। যেমন মনে করুন, একজন বয়স্ক পেশাজীবী কর্মক্ষেত্রে তার পুরনো দিনের ধ্যান-ধারণাকে ঘিরে কাজ করেন। অর্থাৎ কাজের ক্ষেত্রে পুরোন ধ্যান-ধারণাই প্রয়োগ করেন। ফলে তার কাজ ধীর গতিসম্পন্ন হয়। প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এ ক্ষেত্রে তাকে যতই নতুন যুগের প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও কর্মদক্ষতা দেয়া হোক না কেন তার পক্ষে পুরনো দিনের চিন্তা-ভাবনাকে লঙ্ঘন করা সম্ভব হয় না। কাজের ক্ষেত্রে তিনি তার নিজস্ব ধ্যান-ধারণার প্রয়োগ করেন। প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যে এ অবস্থাটি মেনে নেয়া যায় না।

অপরদিকে কোন মানুষের বোধশক্তির যদি ঘাটতি থাকে যার জন্য সে সহজে কোন বিষয় বুঝতে পারে না। তার বিশ্লেষণ ক্ষমতা অত্যন্ত কম। কর্মক্ষেত্রে সে সবার থেকে পিছিয়ে পড়ে। চাকরিতে সে যে পদে ঢুকেছিল সে পদেই বহুদিন ধরে আছে। তার কোন পদোন্নতি হয়নি। এ অবস্থা তাকে মেনে নিতেই হবে। তাকে এবং তার কর্ম প্রক্রিয়াকে মেনে নেয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। অক্ষমতা মেনে নিলে কর্মক্ষেত্রে ও জীবনব্যবস্থায় পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

কাজ - দুই

আপনার পাশের কোন বন্ধুর সাথে বসে এ কাজটি জোড়ায় করতে হবে। এটি সাক্ষাৎকারমূলক কাজ। আপনি আপনার বন্ধুকে প্রশ্ন করবেন। পরে আপনার বন্ধুও আপনাকে প্রশ্ন করবেন। নিচে প্রশ্নের কিছু নমুনা দেয়া হল।

১. আপনার একটি অক্ষমতার কথা বলুন।
২. এর জন্য আপনি কীভাবে আত্মসমালোচনা করবেন?
৩. আপনার কি আত্মশুদ্ধির কোন পথ আছে?
৪. থাকলে সেটি কী?
৫. আপনার এমন কোন দোষ আছে কি যা আপনি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন?

প্রিয় শিক্ষার্থী, উপরের এ প্রশ্নগুলো ছাড়াও আপনারা সুবিধামত অন্য এক বা একাধিক প্রশ্ন ব্যবহার করে সাক্ষাৎকারটি নিতে পারেন।

সারসংক্ষেপ

কর্মক্ষেত্রে মানুষের অপারগতা বা অক্ষমতা এমন কোন দোষণীয় ব্যাপার না যে তার জন্য অনুতাপে মানুষ নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবে। তার জন্য সে দুঃখ প্রকাশ করতে পারে এবং এ দুঃখবোধ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সে নিজের জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নতি করতে পারে। কিংবা যদি তার অক্ষমতা দূর করা না সম্ভব হয় তবে মেনে নিতে পারে। কিন্তু হতাশায় নিমজ্জিত হওয়া উচিত না। কারণ হতাশা মানুষকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে তোলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। আমরা কখন নিজেকে ক্ষমা করতে পারি না ?

ক. যখন কোন কাজে ভুল করি
খ. যখন কোন দোষ করি
গ. নিজের ভুলে যখন হতাশাগ্রস্থ হই
ঘ. যখন ভুল সংশোধন করা যায় না।

২। অক্ষমতাকে মেনে নিতে হয় কেন ?

ক. সংশোধন করা যায় না বলে
খ. হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়লে
গ. নিজেকে ছোট মনে হয় বলে
ঘ. কাজে পিছিয়ে যায় বলে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। আপনার কোন ভুলে আপনি কি প্রকারে আত্মসমালোচনা করেন বিস্তারিত লিখুন?

২। আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা কী ?

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৫ : ১. খ ২. ক

পাঠ-৩.৬ ইতিবাচক মনোভাবাপন্ন মানুষের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ইতিবাচক মনোভাব কী তা বলতে পারবেন।
- নিজের ভিতর ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তুলতে পারবেন।
- ইতিবাচক মনোভাবসম্পন্ন মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করতে পারবেন।

মানুষ একা বেশিদূর পথ চলতে পারে না। সব কাজ একা করতে পারে না। কোন কোন কাজ করতে গেলে এক সময় তার অন্যের সাহায্যের দরকার হয়। জীবনের কোন না কোন জায়গায় তার সঙ্গীর প্রয়োজন হয়। এভাবে দেখা যায় মানুষ সামাজিক জীব। সে কারণে সে আত্মীয়, পরিজন ও বন্ধু নিয়ে জীবন যাপন করে। এসব আত্মীয় বা বন্ধু জীবন পথে চলার জন্য তাকে নির্ভরতা দেয়, সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। তাই এমন বন্ধু দরকার যার উপর সে নির্ভর করতে পারে, যার উপর সে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে। একজন ইতিবাচক মনোভাবাপন্ন বন্ধুই এমন বন্ধু। এমন একজন বন্ধু পেলে জীবনে যত ঝড়ঝঞ্জাই আসুক না কেন বন্ধুর হাত ধরে পার হওয়া যায়। মানুষ সুখী হয়, আত্মশক্তিতে তার জীবন উদ্দীপ্ত হয়।

কাজ - এক

নিচের কাজটি করলে আপনি ইতিবাচক মনোভাবসম্পন্ন মানুষকে চিনতে পারবেন এবং নিজে ইতিবাচক মনোভাবসম্পন্ন কিনা যাচাই করতে পারবেন।

নিচের বাক্যগুলোর মধ্যে কোনগুলো ইতিবাচক চিন্তার জন্য প্রযোজ্য টিক (√) চিহ্ন দিন।

মানুষের দুর্দিনে তার পাশে থাকা।	
যে কোন পরিস্থিতিতে নিজেকে বাঁচিয়ে চলা।	
নিজের স্বার্থ ভুলে অন্যের স্বার্থ রক্ষা করা।	
দ্বিধা না করে মন খুলে কথা বলা।	
মানুষের সাথে প্রথম সাক্ষাতে হেসে সম্ভাষণ করা।	
সব সময় সব মানুষকে বিশ্বাস করা।	
সব সময় আত্মসম্মান বজায় রাখা।	
যে কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা।	
যে কোন মাধ্যমের সাহায্য নিয়ে বন্ধু বা আত্মীয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।	
সব সময় অন্যের সাহায্য নিয়ে নিজের কাজ করা।	

ইতিবাচক ভাবনা কী?

কোন বিষয় সম্পর্কে ভাল দিক চিন্তা করা হোল ইতিবাচক চিন্তা। এখানে ভাল বলতে যা গঠনমূলক তা বোঝানো হয়েছে। যেমন, আপনি আপনার অফিসে বা কাজের জায়গায় দেরী করে পৌঁছালে আপনার বড়র্কতা আপনাকে ডেকে বকাঝকা করেন অথবা আপনার কোন ক্ষতি হয়। নিঃসন্দেহে এতে আপনার মন খারাপ হয়। এর ফলে বড়কর্তার প্রতি আপনি যদি খারাপ ধারণা পোষণ করতে থাকেন, তাহলে আপনার মন সারাক্ষণই বিরূপ হয়ে থাকবে। কখনই শান্তি পাবেন না। দিনে দিনে বড়কর্তার সাথে সম্পর্ক খারাপ হবে। কিন্তু যদি ভাবেন এ আপনার জন্য ভাল হলো, ভবিষ্যতে কাজের জায়গায় যেতে আপনার আর দেরী হবে না। এই ভাবনাটাই ইতিবাচক ভাবনা। যারা ইতিবাচক চিন্তা করে বা ভাবনা করে তারা প্রত্যেক

কাজেই ভাল ফল আশা করে। কারণ তাদের মানসিক শক্তি হয় খুব জোরালো। ইতিবাচক মনের অধিকারী মানুষ সব সময় শরীর ও মনের দিক থেকে সুখী হয়; যে কোন পরিবেশে তারা মানিয়ে নিতে পারে। ইতিবাচক চিন্তার অনেক সুফল আছে। যেমন:

- প্রতিদিনের মানসিক বোঝা কমে যায়।
- নিজের প্রতি বিশ্বাস জন্মে
- জীবন সুস্বাস্থ্যের ও দীর্ঘায়ু হয়
- অনেক বন্ধু পাওয়া যায়
- কোন বিষয়ে খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নেয়া যায়।

ইতিবাচক চিন্তা কীভাবে করা যায়?

একজন ভাল বন্ধু পেতে হলে নিজেকে সেভাবে গড়ে নিতে হয়। আপনি ভাল চিন্তা করুন আর না করুন, মনে রাখবেন এখন থেকে ভাল চিন্তা করতে শুরু করতে হবে। কোন কাজ শুরু করতে একটু সমস্যা হয়, চট করে হয় না। রাতারাতি কোন অভ্যাস গড়ে তোলা যায় না। তার জন্য অনুশীলন করা ভাল। আসুন দেখা যাক কীভাবে ভাল চিন্তা করতে শুরু করা যায়।

১. যখন কথা বলবেন তখন ইতিবাচক শব্দ ব্যবহার করবেন। প্রশ্ন হল ইতিবাচক শব্দ কী? আপনি যদি সব সময়ই নিজেকে বলেন যে আমি এটা পারবো না, তাহলে আপনার দ্বারা কোন দিনই কোন কাজ হবে না। বরং নিজেকে বলুন, হ্যাঁ, এটা আমি পারবো। তাহলে দেখবেন কাজটি যত কঠিনই হোক না কেন আপনার তা গায়ে লাগবে না। এটাই ইতিবাচক শব্দ।
২. মন থেকে খারাপ চিন্তাগুলো সরিয়ে দিয়ে ভাল চিন্তা করুন। যেমন, কোন মানুষ সম্পর্কে চিন্তা করার সময় তিনি যতই খারাপ মানুষ হন না কেন, তার ভাল দিক নিয়ে চিন্তা করুন। বলুন, লোকটার এই ভাল গুণটি আছে।
৩. যা ভিতর থেকে আপনাকে আত্মশক্তি দেয় এমন কথা বলুন। যে বিষয়টি আপনাকে আনন্দ দেবে, আপনাকে খুশি করতে পারবে সে বিষয় নিয়ে ভাবুন। যেমন, পরীক্ষায় পাশ করলে আপনার আনন্দ হবে, তাইনা? তাহলে বলুন, আমি অবশ্যই ভালভাবে পাশ করব। তাতে দেখবেন ভালভাবে পাশ করার জন্য আপনি পরিশ্রম করতে পারেন এবং আপনার কষ্ট হবে না।
৪. নিজেকে বার বার ইতিবাচক ভাবনায় ধরে রাখুন। যেমন বলুন, একজন সুখী মানুষ হওয়ার সব কিছুই আমার আছে, আমি সুখী হবই।
৫. কোথাও কোন ভুল হলে বা খারাপ কিছু হয়ে গেলে, নিজেকে ক্ষমা করে দিন। মানুষ সব সময় সঠিক কাজটি করতে পারে না। অনেক সময় ভুল বা অন্যায় হয়ে যেতে পারে, তার জন্য নিজেকে দোষারোপ করবেন না। বরং কী জন্য এমন ভুল হল তা ভাবুন। কারণ আপনি ভুলটি করতে চাননি।

মনে রাখবেন, আজকে আপনার ভাল যা কিছু আছে, অতীতে তা ভেবেছিলেন বলেই পেয়েছেন এবং আজকে ভাল যাকিছু ভাববেন ভবিষ্যতে তা আপনার থাকবে।

এবার আসুন আমরা একটি গল্প পড়ি-

তরুন নতুন একটি চাকরির জন্য দরখাস্ত করল কিন্তু সে বিশ্বাস করে না যে সে চাকরিটি পাবে। কারণ তার আত্মবিশ্বাস ছিল খুবই কম। সে সব সময় মনে করতো তার দ্বারা কিছু হবে না। নিজের প্রতি তার নেতিবাচক মনোভাব ছিল এবং সে

জন্য সে ভাবতো যে তার সাথে অন্য যারা দরখাস্ত করেছে তাদের সবার তার থেকে অনেক বেশি যোগ্যতা আছে এবং তারা অনেক বেশি বুদ্ধিমান।

চাকরির সাক্ষাৎকারের দিন যত বেশি এগিয়ে আসতে লাগল তরুন তত বেশি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। সাক্ষাৎকারের কথা যতই সে ভাবতো ভয়ে তার হাত পা কাঁপতো, বার বার সে ঘেমে উঠতো, রাতে ভাল করে ঘুম হতো না।

সাক্ষাৎকারের নির্ধারিত দিনে সে দেরী করে ঘুম থেকে উঠল এবং সে দেখল যে সে যে শার্টটি পরে যাবে বলে ঠিক করেছে সেটি ময়লা হয়ে আছে। অন্য একটি শার্ট পরিষ্কার ছিল কিন্তু সেটি ইস্ত্রি করা নেই। অথচ শার্ট ইস্ত্রি করার মতো সময়ও তার হাতে নেই। কী আর করা? সে ঐ কোঁচকানো শার্টটি পরেই সাক্ষাৎকারের জন্য রওয়ানা দিল। ঘর থেকে বেরুবার সময় সে কিছুই খেল না; কারণ এমনিতেই তার অনেক দেরী হয়ে গেছে।

যথাসময় সাক্ষাৎকার শুরু হল। তরুন এমনিতে ছিল ক্ষুধার্ত, তারপর তার কোচকানো শার্টটি নিয়ে যথেষ্ট ভয় ছিল। সব মিলিয়ে সাক্ষাৎকারের টেবিলে সে সব প্রশ্নের উত্তর গুলিয়ে ফেলল। অর্থাৎ তার সাক্ষাৎকার ভাল হল না এবং চাকরিটি সে পেল না।

একই পদের জন্য সেলিমও দরখান্ত করেছিল। কিন্তু সেলিমের মানসিকতা ছিল ভিন্ন। সে ভাবত চাকরিটি সে পাবে এবং পাওয়ার জন্য যা করার দরকার তা সে করত। অর্থাৎ সাক্ষাৎকারের জন্য সে মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করে প্রস্তুতি নিত। সাক্ষাৎকারের আগের দিন সন্ধ্যায় সে তার জামা-কাপড়, জুতো, কাগজপত্র, কলম ইত্যাদি ঠিকঠাক করল এবং অন্যদিনের তুলনায় একটু আগে ঘুমাতে গেল।

সাক্ষাৎকারের দিন সে ভোরে ঘুম থেকে উঠল এবং হাতে পর্যাপ্ত সময় থাকায় সে বোর্ডে উপস্থিত হওয়ার জন্য ধীরেসুস্থে নিজেকে তৈরি করল। সাক্ষাৎকারের টেবিলে কর্মকর্তাদের মাঝে সে চমৎকার একটি পরিবেশ তৈরি করল যাতে তারা সকলে সেলিমের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন। সুতরাং সেলিম চাকরিটি পেল।

উপরের গল্প দুটি থেকে আমরা কী জানতে পেরেছি?

এর ভিতরে কি কোন ম্যাজিক ছিল? নিশ্চয়ই না? সব কিছু খুব স্বাভাবিকভাবেই ঘটেছিল।

এ থেকে আমরা এটাই জানতে পারি যে, ইতিবাচক মনোভাব মানুষকে প্রশান্ত ও সুখময় অনভূতি দেয়। তার চোখের সামনে পৃথিবীটা আলোময় হয়ে ওঠে, সে আত্মশক্তি অনুভব করে। ফলে তার হাঁটাচলা, কথাবার্তা, অভিব্যক্তি সব কিছুতেই আত্মবিশ্বাস ফুটে ওঠে। মানুষ দেহমনে সুস্থ থাকে এবং সব কাজেই সে প্রত্যাশিত ফল লাভ করে। এটাই ইতিবাচক চিন্তার শক্তি।

একজন ইতিবাচক মানুষ হিসেবে যদি আপনি নিজেকে গড়ে তুলতে পারেন তবেই একজন ভাল বন্ধু অর্থাৎ ইতিবাচক মনোভাবসম্পন্ন বন্ধু পাওয়ার আশা করতে পারেন।

আসুন দেখি কীভাবে ইতিবাচক মনোভাবসম্পন্ন মানুষের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলা যায় -

- প্রথমে এটি নিশ্চিত করুন যে, আপনি নিজে একজন ইতিবাচক মনোভাবসম্পন্ন মানুষ।
- যার সাথে আপনি বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে চাচ্ছেন তার অভ্যাস, আগ্রহ এবং সে যে কাজগুলো করে সেগুলোর দিকে লক্ষ করুন এবং নিজের মধ্যে সেগুলো গড়ে তুলুন।

- দৈনন্দিন সামাজিক ক্ষেত্র যেমন, বাজার, মসজিদ বা মন্দির ইত্যাদিতে প্রতিদিন যাদের সাথে দেখা হয় তাদের সাথে ভাবের আদান প্রদান করে দেখুন আপনার রুচির সাথে মেলে কিনা, যদি মেলে তবে তার সাথে বেশি করে মেলামেশা করুন।
- সামাজিক অনুষ্ঠান বা মিলনকেন্দ্র যেমন, মসজিদ, পার্ক বা খেলার মাঠ ইত্যাদিতে নিয়মিত অংশগ্রহণ করুন।
- বন্ধুর সাথে যথেষ্ট সময় নিয়ে কথা বলুন, তাদের সাথে নিয়মিত দেখা করুন। যেন সে বুঝতে পারে যে আপনি তার কথা ভাবেন, তার প্রতি আপনার আগ্রহ আছে।
- বন্ধুর সমস্যার কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনুন এবং সমাধানের জন্য আগ্রহী হ'ন।
- দৈনন্দিন সামাজিক ক্ষেত্র যেমন, বাজার, মসজিদ বা মন্দির ইত্যাদিতে প্রতিদিন যাদের সাথে দেখা হয় তাদের সাথে সাম্প্রতিক বিষয় যেমন, বাজার দর, আবহাওয়া ইত্যাদি নিয়ে মতামত বিনিময় করুন।
- বন্ধুর কাজের সাথে নিজের কাজ মিলিয়ে দেখুন কোথায় মিল পাওয়া যায়, সেখানে কাজ ভাগ করে নিন।
- আপনার এলাকা/জেলা/থানা থেকে যে দৈনিক বা সাপ্তাহিক কাগজ বের হয় তা নিয়মিত পড়ুন এবং বন্ধুর সাথে তার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করুন।
- যে বিষয় নিয়ে আপনারা একমত সে বিষয় নিয়ে কথা বলুন।

বন্ধুর সাথে যেখানেই যান বা যে কাজই করুন না কেন সব সময় তাকে সত্যি কথা বলবেন। তার সাথে প্রতারণা করবেন না, তাকে ঠকাবেন না। একজন ইতিবাচক মনোভাবসম্পন্ন মানুষ কখনও একাজ করে না। বন্ধুত্ব সম্পর্কটিতে পারস্পারিক বিশ্বাস অর্জন বড় কথা। অতএব তার বিশ্বাস অর্জন করুন।

কাজ - দুই

এই কাজে আপনাকে এমন একজন মানুষকে খুঁজে বের করতে হবে যিনি আপনার পার্শ্ববর্তী কোন ব্যক্তি। তিনি আপনার সহপাঠী বা সহকর্মী বা প্রতিবেশী বা আত্মীয় হতে পারেন। যাকে আপনি পছন্দ করেন। তার সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে আপনি আগ্রহী। তার ভাল দিক বা গুণগুলো লিখুন। সেইসব গুণ লিখুন যা আপনার ভাল লাগে।

এবার আপনার নিজের দিকে লক্ষ করুন। আপনার ভিতর সেইসব গুণগুলো খুঁজে বের করুন এবং লিখুন যে গুণগুলোা অন্যেরা প্রশংসা করে। এবার দুজনের গুণগুলো নিয়ে মেলান। যেগুলো মিলে যায় সেগুলোকে পৃথক করুন এবং আপনার পছন্দের মানুষকে দেখান।

সারসংক্ষেপ

ইতিবাচক চিন্তাসম্পন্ন মানুষ নিজেকে এমনভাবে তৈরি করেন যে অন্য সব মানুষই তাকে পছন্দ করেন, তার প্রশংসা করেন। ফলে তিনি সহজেই বন্ধুলাভ করেন। কিন্তু জীবনের পথটিকে সহজ করতে তিনি ইতিবাচক মনোভাবাপন্ন মানুষের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলেন। এ রকম বন্ধুই বিপদে তাকে আলো দেখায়, তাকে সুখী করে তোলে। বন্ধুত্বের এই সম্পর্কে তারা একে অপরের উপর আস্থা স্থাপন করতে পারেন। ফলে জীবন অনেক সহজ ও সুন্দর হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোনটি ইতিবাচক চিন্তার কাজ ?

ক. মানুষকে বিপদে না ফেলা
খ. অন্যের ভুল ধরিয়ে দেয়া
গ. মানুষের সাথে বেশি করে মেশা
ঘ. মানুষকে বিপদে সাহায্য করা ।

২। আপনি ইতিবাচক বন্ধুলাভ করবেন কীভাবে ?

ক. বন্ধুর সাথে বেশি করে মিশে
খ. বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করলে
গ. বন্ধুর আস্থা অর্জন করলে
ঘ. বন্ধুকে বিপদে না ফেললে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। আপনি কীভাবে নিশ্চিত হতে পারেন যে আপনি একজন ইতিবাচক চিন্তাসম্পন্ন মানুষ?

২। ইতিবাচক বন্ধু পেতে আপনি কীভাবে চেষ্টা করবেন?

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৬ : ১. ঘ ২. গ

পাঠ-৩.৭ কর্মে সফলতায় মূল্যবোধ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মূল্যবোধ কী তা বলতে পারবেন;
- পেশাক্ষেত্রে কীভাবে মূল্যবোধ প্রয়োগ করবেন তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- মূল্যবোধ প্রয়োগ করে পেশাজীবনকে সফল করে তুলতে পারবেন।

প্রতি মানুষই কর্ম জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করতে চায়। সুদীর্ঘ কর্মজীবন ধরে সে জন্য তার চেষ্টার শেষ নেই। বিভিন্নভাবে শিক্ষালাভ করে, প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে, নানারকম কৌশল প্রয়োগ করে মানুষ চেষ্টা করে একজন সার্থক পেশাজীবী হয়ে উঠতে। অনেক সময় এ উদ্দেশ্যে সত্য-অসত্য, ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ এসব কেউ বিচার করে না। সব ধরনের পথেই সে চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। হয়তো এভাবে মানুষ জীবনে প্রতিষ্ঠা পায়। তবে সে প্রতিষ্ঠায় আত্মতৃপ্তি নেই। ফলে একদিকে যেমন তার দুর্নাম হয়, অন্যদিকে সে একজন বিভ্রান্তিময় জীবনের অধিকারী হয়। দেখা যায় বস্তুগত বহু সুখ তার ভাগ্যে জোটে কিন্তু স্বস্তি সে পায়না। তার অন্যতম কারণ হল ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের জন্য কল্যাণকর সে কিছু করেনি। বরং অনেকক্ষেত্রে ক্ষতি করেছে। তাই পেশাজীবনে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য শুধুই জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ করলে চলে না, তাকে কৌশলী হতে হয়। পেশাক্ষেত্রে মূল্যবোধ চর্চার প্রয়োগই হল এ কৌশলের প্রধান উপায়।

মূল্যবোধসম্পন্ন একজন পেশাজীবী একইসঙ্গে নিজের এবং প্রতিষ্ঠানের উন্নতি করতে পারেন। সমাজে এ ধরনের মানুষের সুনাম ছড়িয়ে পড়ে।

কাজ - এক

নিচের কাজটি করে আপনি আপনার মূল্যবোধের স্তর সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন।

নিচের সমস্যাগুলো আপনার অভিজ্ঞতা থেকে কীভাবে সমাধান করবেন-লিখুন।

সমস্যা ১ ঃ পরীক্ষার পূর্বরাতে আপনার একজন সহপাঠি কিছু প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য আপনার বাসায় এল। আপনি কী করবেন?

____

____

____

সমস্যা ২ ঃ আপনার একজন প্রতিবেশী প্রতি রাতে তার বাড়ির ময়লা-আবর্জনা আপনার বাড়ির সামনে ফেলে রেখে যান। আপনি কী করবেন?

____

____

____

সমস্যা ৩ ঃ একজন কড়া মেজাজের শিক্ষকের কাছে কিছু প্রশ্নের সমাধানের জন্য কীভাবে যাবেন?

____

____

____

সমস্যা ৪ ঃ মধ্যরাতে পাশের বাড়ি থেকে হৈ চৈ এর শব্দ এলে আপনি কী করবেন?

মূল্যবোধ কী ?

মানুষ যার উপর আস্থা রাখতে পারে তাকে বিশ্বাস করে। বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। মূল্যবোধকে প্রয়োগ করতে হয়। বিশ্বাস যে দিক নির্দেশনা দেয় মানুষ সেখানেই মূল্যবোধ ব্যবহার করে বা প্রয়োগ করে। বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে জীবন পরিচালিত হয়। কিন্তু জীবন পরিচালনার মাধ্যম হল কর্ম। এই কর্মের মধ্য দিয়ে মূল্যবোধ বিকাশলাভ করে। যেমন, একজন মানুষ মানবিকতায় বিশ্বাস করেন। সে কারণে তিনি জীবজগতের প্রতি মানবিক আচরণ করেন। অর্থাৎ তিনি মানবিক আচরণকে মূল্য দেন। এটাই তার মূল্যবোধ। এখানে আমরা দেখতে পেলাম মানবিক আচরণের মধ্য দিয়ে তিনি তার মূল্যবোধকে প্রয়োগ করেছেন। মূল্যবোধের মধ্য দিয়ে আমরা কি তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারি? অবশ্যই পারি। মানবিকতা তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। সুতরাং মানুষের চরিত্র গঠনে মূল্যবোধের বিকাশ খুব গুরুত্বপূর্ণ।

এপ্রসঙ্গে একটি গল্প বলি শুনুন –

একজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোক তার গৃহ নির্মাণের জন্য ইট, সিমেন্ট ও বালু দিয়ে শক্ত ভিত গঠন করল। অন্যদিকে একজন অসতর্ক লোক শুধুই কাদামাটির উপর নির্মাণ করল তার গৃহ। পরে যখন ঝড় ও বৃষ্টি হল তখন খুব সহজেই অসতর্ক লোকের ঘর ভেঙে পড়ল। কিন্তু সতর্ক লোকের ঘর মজবুত রইল।

গল্পটি অত্যন্ত সাধারণ কিন্তু এর অর্থ খুব গুরুত্বপূর্ণ। জীবন পরিচালনার প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনি যদি কাঙ্ক্ষিত মূল্যবোধ প্রয়োগ করে চলেন, তবে দেখা যাবে আপনি একজন সার্থক মানুষে পরিণত হয়েছেন। অন্যদিকে দুর্বল মূল্যবোধের প্রয়োগ মানুষের জীবনকে নষ্ট করে দেয়।

এই কাঙ্ক্ষিত মূল্যবোধ কী?

জগতের কল্যাণে যে মূল্যবোধ কাজ করে তাই হল কাঙ্খিত মূল্যবোধ। অর্থাৎ আপনার সেই মূল্যবোধ প্রত্যাশা করা হয় যা একটি সুখী ও সম্মৃদ্ধশালী সমাজ তথা জগৎ সৃষ্টি করতে পারে। যুগে যুগে মহামানবরা তাদের নৈতিকতায় সম্মৃদ্ধ মূল্যবোধ প্রয়োগ করে জগতকে কল্যাণের পথে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছেন।

আপনি কি ভাবছেন পেশাক্ষেত্রে মূল্যবোধ কোথায় ও কীভাবে কাজে লাগাবেন? আপনি একজন পেশাজীবী বা ব্যবসায়ী যাই হোন না কেন, সব ক্ষেত্রেই প্রয়েজনীয় মূল্যবোধ প্রয়োগ করে আপনি সফলতার চূড়ান্তে পৌঁছাতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে ব্যবহার করার মত কয়েকটি মূল্যবোধ এখানে দেয়া হল,

— সত্যকে জানা ও বাস্তবক্ষেত্রে তা অনুশীলন করা
— লোভ না করা
— মনোযোগ দিয়ে নিষ্ঠার সাথে কাজ করা
— যে কোন ক্ষেত্রে সময়মত উপস্থিত হওয়া
— সততা অবলম্বন করা
— পরশ্রীকাতর না হওয়া
— পরচর্চা ও পরনিন্দা না করা
— নিজের দুর্বলতা গোপন না করা
— প্রয়োজনীয় গোপনীয়তা রক্ষা করা
— সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করা।

পেশাক্ষেত্রে মূল্যবোধের প্রয়োগ

কর্মে কুশলতা আনার জন্য মানুষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। কিন্তু শুধুই দক্ষতা দিয়ে কোন কাজ প্রয়োগ করা যায় না। কাজটি সম্পূর্ণ করে তুলতে কর্মদক্ষতার পাশাপাশি মূল্যবোধেরও প্রয়োগ দরকার। অন্যথায় কাজটি সম্পূর্ণ হবে না। তাই শুধু কর্ম প্রশিক্ষণ না, মূল্যবোধ ও তা প্রয়োগ কৌশল জানার প্রয়োজন আছে। নিচে কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য কতগুলো মূল্যবোধ উল্লেখ করা হলো:

বলিষ্ঠ কর্মনীতি: পেশাক্ষেত্রে কর্তাব্যক্তিরা সেইসব পেশাজীবীকে বেশি পছন্দ করেন যারা অনেক পরিশ্রম করতে পারে। শুধু অনেক পরিশ্রম করতে জানলে হবে না, কাজ অনেক পরিচ্ছন্নভাবে করতে জানতে হবে। অর্থাৎ কর্তাব্যক্তিরা দেখেন একজন চাকরিজীবী কত দক্ষতার সাথে, অল্প সময়ে, কত কৌশলে কাজটি শেষ করেছেন।

যেমন, আপনি যখন পরীক্ষা দিতে বসেন তখন আপনাকে সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে যেনতেনভাবে পরীক্ষা শেষ করলে কী ভাল পরীক্ষা দেয়া হলো? অবশ্যই না। ভাল পরীক্ষা দিতে হলে আর কী কী করা দরকার, ভাবুন এবং লিখুন।

বলিষ্ঠ কর্মনীতি হল একদম সময় নষ্ট না করে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে কোন কাজ শেষ করা। এখানে মনে রাখতে হবে কাজ করার সময় চাকরির কাজ ছাড়া অন্য কোনভাবে সময় ব্যয় করা চলবে না। একে বলে সময় ব্যবস্থাপনা। অর্থাৎ অল্প সময়ে কাজটি সুষ্ঠুভাবে শেষ করাকে সময় ব্যবস্থাপনা বলা হয়।

আধুনিক প্রতিযোগিতার বাজারে কোন কাজ করার জন্য সময়ের সুষ্ঠু ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

দায়িত্বসম্পন্নতা: আপনাকে অফিসের বড়কর্তারা পছন্দ করবেন যদি আপনি সঠিক সময়ে অফিসে উপস্থিত হন। শুধু তাই না আপনাকে কথায় এবং কাজে অনেক বেশি দায়িত্ব নিতে হবে। অর্থাৎ যা বলবেন ও যা করবেন তা যেন নির্ভুল ও পরিচ্ছন্ন হয়। কাটাকাটি, নোংরা, দাগ লাগানো, এমন যেন না হয়। এখানে আর একটি ব্যাপার গুরুত্বপূর্ণ তা হল আপনি যা করবেন ও যা করছেন তা যেন অবশ্যই কর্তাব্যক্তির জানা থাকে। তাকে গোপন করে কোন কাজই করবেন না।

ইতিবাচক মনোভাব: আপনি অফিসের প্রিয়পাত্র হবেন যদি আপনি কোন কাজের উদ্যোগ নিজেই নেন এবং তা সময়মত শেষ করেন। আমরা আগের পাঠে পড়েছি যে ইতিবাচক মনোভাবাপন্ন মানুষ কাজে উদ্যোগী হয় এবং সময়ের প্রতি সচেতন থাকে। কাজের প্রতি আপনার আগ্রহ যত বৃদ্ধি পাবে আপনি কাজের পরিবেশকে তত সুন্দর করে তুলতে পারবেন। অর্থাৎ আপনার মনোভাব ইতিবাচক করুন, দেখবেন কাজ করতে আনন্দ পাচ্ছেন।

সঙ্গতি রাখার ক্ষমতা: যে কোন পরিবেশে বা যে কোন অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেয়া একটি মস্ত বড় গুণ। এমন লোককে সবাই পছন্দ করে। এমনকি কাজের পরিবেশ বদলে গেলেও এমন মানুষের কোন অসুবিধা হয় না। তিনি যথা নিয়মে এবং যথা সময় কাজ সুসম্পন্ন করতে পারেন। অনেক সময় কাজের গতি বৃদ্ধি করার জন্য বা কাজটি সুন্দর করে করার জন্য পরিবেশ বা অবস্থার পরিবর্তন করতে হয়। যে কোন পরিবেশের সঙ্গে যাদের সঙ্গতি রাখার ক্ষমতা আছে তারা এ ধরনের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে পারেন এবং দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারেন।

সততা ও শুদ্ধতা: যারা সততা ও শুদ্ধতাকে মূল্য দেন ব্যক্তি মানুষ হিসেবে তারা সবার উপরে। সমাজের সর্বত্রই তারা সমাদৃত। আমরা জানি বিশ্বাসের উপর পারস্পারিক সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। কর্মক্ষেত্রের জন্যেও এ কথা সত্যি।

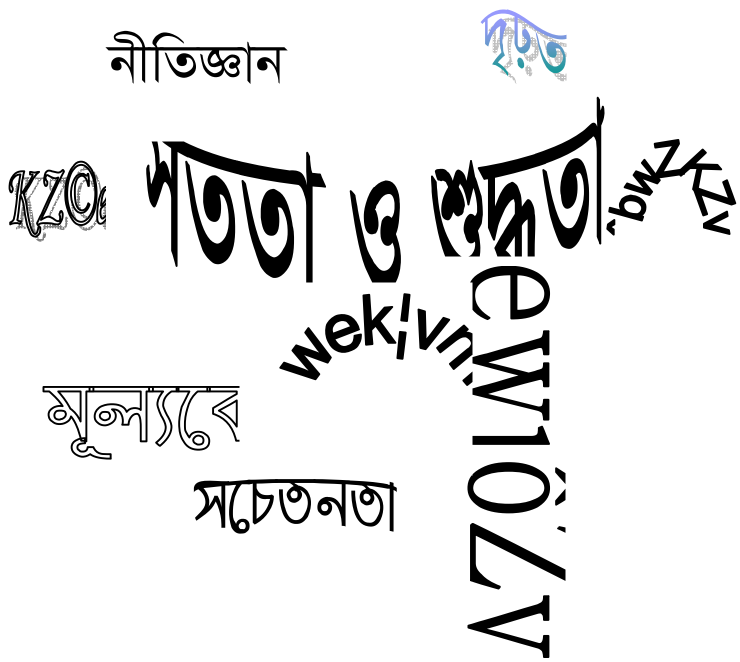

যারা আপনাকে কাজটি করতে দিয়েছেন তারা আপনার কথা ও কাজ এর উপর কতটা নির্ভর করতে পারেন বা আপনাকে কতটা বিশ্বাস করতে পারেন তা আপনাকে ভাবতে হবে। অর্থাৎ আপনাকে বিশ্বস্ত থাকতে হবে। যা বলবেন তাই করবেন। কথায় ও কাজে যেন অমিল না থাকে। চাকরিক্ষেত্রে যতটা সুযোগ থাকে ততটা সততা ও নৈতিকতাকে ব্যবহার করে কাজ করুন।

নিজেকে উদ্বুদ্ধ করা বা আত্মপ্রণোদন: কোন কাজ সম্পন্ন করতে আপনাকে যেন বার বার দেখিয়ে দিতে না হয়। চেষ্টা করবেন মনোযোগ দিয়ে একবারেই বুঝে নিতে। আপনার কী কাজ তা বুঝতে আপনার বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করুন। আগ্রহী হন এবং মনোযোগ দিন। দেখবেন, অল্প সময়ের মধ্যে কাজটি সম্পন্ন করে আপনি নিজেই সন্তুষ্ট হচ্ছেন।

আত্মবিশ্বাস: চাকরিতে প্রতিষ্ঠালাভের একটি স্বাভাবিক ও সহজ শর্ত হল আত্মবিশ্বাস। আত্মবিশ্বাস যার নেই সে জীবনে সফল হতে পারে না, এ কথাটি সবাই স্বীকার করে। আত্মবিশ্বাসী মানুষ একদিকে যেমন অন্যদেরকে অনুপ্রেরণা দিতে পারে। অন্যদিকে নিজের জ্ঞান বৃদ্ধি করার জন্য যে কোন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে ভয় পায় না। এ ধরনের মানুষ যেটা উচিত বলে মনে করে তা সে করবেই, কোন ভয় বা বিপদের পূর্বাভাস তাকে পিছু হটাতে পারে না। নিজের প্রতি বিশ্বাসই হল তার প্রথম ও প্রধান সম্পদ।

পেশাদারিত্ব: যারা তাদের চাকরির খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করে এবং কোন কাজ সুসম্পন্ন করতে তার সর্বাত্মক চেষ্টা প্রয়োগ করে পেশাক্ষেত্রে তাদের সার্থকতা একশ ভাগ নিশ্চিত। তার আচরণ, কথাবার্তা, পোশাক-আশাক এসবকিছু দেখে তার পেশাগত পরিচয় বোঝা যায়। এটাই একজন মানুষের পেশাদারিত্ব। পেশাদারিত্ব সম্পন্ন পেশাজীবী নিজের কাজ ও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সব সময় আশাবাদী থাকেন। আত্মবিশ্বাসও তার একটি প্রধান সম্পদ।

উপরে উল্লিখিত এধরনের মূল্যবোধ কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করে একজন পেশাজীবী তার কর্মজীবনকে সার্থক করে তুলতে পারেন। এজন্য জীবনের প্রতিটি স্তরে মূল্যবোধ সম্বন্ধনীয় জ্ঞান আহরণ করতে হয় ও তার চর্চা করতে হয়।

মূল্যবোধ প্রয়োগে কর্মে সফলতা

আপনার মূল্যবোধ পেশা ক্ষেত্রে সার্থকতা অর্জনের ভিত হিসেবে কাজ করবে। পেশাজীবন অল্প সময়ের কোন ব্যাপার না। মানুষের দীর্ঘ জীবনের সাথে পেশাজীবন চলতে থাকে। অর্থাৎ যতদিন মানুষ কর্মক্ষম থাকে ততদিন তাকে পেশাজীবনে কাজ করতে হয়। তাই এ জীবনটি শক্ত করে গড়ে তোলা প্রয়োজন। এ জীবনের মূল্যবোধ রচিত ভিত হবে এমন যে তা দিয়ে প্রতিষ্ঠান বা কোন সংস্থা উপকৃত হবে, মানুষের জীবন ধন্য হবে এবং সার্বিক পরিস্থিতি সফলতায় পূর্ণ হবে।

মূল্যবোধ কীভাবে পেশা ক্ষেত্রকে সমুজ্জল করে তা জানার আগে আমাদের বুঝতে হবে পেশাজীবনে একজন মানুষের সুনাম খুব প্রয়োজন। এই সুনাম শুধুই তার দক্ষতার সুনাম না বরং তার উন্নত চরিত্রেরও সুনাম। অনেকেই আছেন যারা অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর টাকা উপার্জন করতে চান ও খুব দ্রুত পদোন্নতি পেতে চান। তারা হয়তো পেয়েও থাকেন, কিন্তু জীবনের শেষে এসে তাদের আত্মতৃপ্তি থাকে না কারণ এতসব পাওয়ার জন্য সারাজীবনে তাদের হয়তো অনেক নৈতিকতা ও মূল্যবোধকে বিসর্জন দিতে হয়েছে।

সাধারণ বুদ্ধি, সরল মানসিকতা, আশাবাদ, প্রতিভা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, কঠোর পরিশ্রম, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদির ব্যবহার করে মানুষ তার ব্যক্তিগত ও পেশাজীবনের লম্বা পথ চলে। কাজ করতে করতে কোন এক জায়গায় মানুষ তার অজ্ঞতার জন্য আটকে যেতে পারে এবং সে জন্য তার অন্য কারও সাহায্য নিতে হতে পারে, কিন্তু কাজটি সে করবে তার নিজের নীতি ও মূল্যবোধ দিয়ে। সেখানে সে একাই সিদ্ধান্ত নেবে, অন্য কারও সিদ্ধান্ত সে গ্রহণ করবে না। এটাই তার চারিত্রিক দৃঢ়তা। আমরা যেমন দেখেছি মূল্যবোধ মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গঠনে সাহায্য করে, তেমনই মূল্যবোধের প্রয়োগ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে দৃঢ়তা প্রদান করে।

কাজ - দুই

এ কাজটি আপনাকে পেশাক্ষেত্রে মূল্যবোধ চিহ্নিতকরণের দক্ষতা উন্নয়নে সাহায্য করবে এবং কীভাবে সে মূল্যবোধ পেশাগত উন্নয়নে অবদান রাখে তা লিখতে পারবেন।

নিচের গল্পটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

শাহীনূর একজন ব্যাংক কর্মকর্তা। ব্যাংকের চাকুরিকে তিনি শুধুই পেশা হিসেবে দেখেন না। তার মনে হয় তার এ পেশার সুনির্দিষ্ট একটি লক্ষ্য আছে, তা হলো প্রতিষ্ঠানের সর্বাঙ্গিন বিকাশ তথা দেশ ও জাতির উন্নয়ন। ব্যাংক কর্মকর্তা হিসেবে পেশাগত উন্নয়নকে তিনি খুব কঠিন কাজ মনে করেন না। কারণ উন্নয়নের জন্য তিনি সব সময় যথাযথ প্রস্তুতি নিয়ে অফিসে আসেন। শাহীনূর কাজ করতে আনন্দবোধ করেন। সকলের সাথে তিনি নম্র, ভদ্র ও মার্জিত ব্যবহার করেন। তার সাথে যাঁরা কাজ করেন তাঁরা উৎসাহী, আগ্রহী ও প্রানবন্ত হয়ে একসাথে কাজ করতে ভালবাসেন। সমস্যা সমাধান করতে তিনি পদ্ধতিমত সর্বাত্মক চেষ্টা করেন, না পারলে খুব সহজ ও সৌজন্যমূলক আচরণ করে অন্যের সাহায্য চান। তার অমায়িক ব্যবহারে অফিসের সবাই তাকে সাহায্য করতে পারলে খুশি হয়। ব্যাংকিং সম্বন্ধে যে কোন নতুন তথ্য তাকে আকৃষ্ট করে। নতুন তথ্য কীভাবে কাজে লাগানো যায় তিনি চিন্তা-ভাবনা করতে শুরু করেন। এখানে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী তার প্রিয়পাত্র। নিজের ছাড়াও অন্যের প্রতি কোন দায়িত্ব পালনে তিনি সদা তৎপর থাকেন। ব্যাংকের এ চাকুরি সম্বন্ধে তার ধারণা জীবনকে আনন্দময় ও অর্থপূর্ণ করে তোলার জন্য গভীর মনোযোগ ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যেতে হবে। অফিসের বাইরেও সমাজের সকলের সাথে তিনি সদ্ভাব রাখেন এবং কাউকে ছোট মনে করেন না।

১. শাহীনূর কেমন ধরনের মানুষ?
২. তার মূল্যবোধগুলো লিখুন।
৩. এসব মূল্যবোধ তাকে পেশাগত উন্নয়নে কীভাবে সাহায্য করতে পারে লিখুন।

সারসংক্ষেপ

পেশাক্ষেত্রে ব্যক্তির কর্মদক্ষতার পাশাপাশি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সমানভাবে মূল্যায়ন করা হয়। কারণ সে যখন কাজ করে তখন শুধুই কর্মদক্ষতার সাহায্যে করে না, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও সেখানে প্রতিফলিত হয়। মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গড়ে

ওঠে তার বিশ্বাস তথা মূল্যবোধের উপর। দক্ষতা অর্জনের সাথে সাথে তাকে মূল্যবোধও অর্জন করতে হয়। দৈনন্দিন জীবনে সকল কাজে যদি প্রত্যাশিত মূল্যবোধ চর্চা করা যায় তবে সে মূল্যবোধ তার ব্যক্তিগত চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। তখন সে প্রাতিষ্ঠানিক সকল কাজে প্রয়োজনীয় মূল্যবোধ প্রয়োগ করতে পারে। এর ফলে ব্যক্তিগত উন্নতির পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানিক উন্নতিও তার দ্বারা সম্ভব হয়। উন্নত চরিত্রের একজন মানুষকে সকলেই ভালবাসে। সে সকলের সাহায্য লাভ করে। ফলে সে সকল কাজে কৃতিত্বের ছাপ রাখে এবং একজন সুখী ও সফল মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। একজন মহিলা প্রতিদিন একজন ভিক্ষুককে একবার করে ভাত খেতে দেন। এখানে তার কোন মূল্যবোধ কাজ করে?
ক. তিনি ভিক্ষুককে সাহায্য করেন
খ. তিনি অভ্যাসের বসে এ কাজ করেন
গ. তিনি দুঃস্থের সেবা করেন
ঘ. তিনি একজন করে লোক খাওয়ান ।

২। দায়িত্ব সম্পন্নতা বলতে কোনটিকে বোঝানো হয়?
ক. সময়মত অফিসে উপস্থিত হওয়া
খ. সকলে মিলেমিশে একসাথে কাজ করা
গ. একটি কাজ সম্পূর্ণভাবে নিজে করা
ঘ. যে কোন কাজ সঠিক নিয়মে করা।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। পেশাক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য আপনার ভিতর কী কী মূল্যবোধ আছে লিখুন। কীভাবে এসব মূল্যবোধ আপনি অর্জন করেছেন ব্যাখ্যা করুন।

২। মূল্যবোধ কীভাবে মানুষকে সফল করে তোলে?

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৭ : ১. গ ২. ক

পাঠ-৩.৮ সহমর্মিতা, পারস্পারিক নির্ভরশীলতা ও আস্থা স্থাপন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সহমর্মিতা কী তা বলতে পারবেন।
- সহমর্মিতার সাহায্যে কীভাবে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হওয়া যায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সহমর্মিতা প্রয়োগ করে পারস্পারিক নির্ভরশীলতার মাধ্যমে একে অপরের উপর আস্থা স্থাপন করতে পারবেন।

প্রাণিকুলের মধ্যে মানুষ সবচেয়ে সফলভাবে সমাজ গড়ে তুলেছে। সফল বলা হয় এ কারণে যে, সমাজে মানুষের সাথে মানুষের ঘনিষ্ট সম্পর্ক বিরাজ করে। এ সম্পর্ক এমনি এমনি গড়ে ওঠে না। তার জন্য মানুষের ভিতর পারস্পারিক প্রেম ও ভালবাসা যেমন থাকতে হয় তেমনই একে অপরের উপর নির্ভরশীলতা থাকতে হয়। দৈনন্দিন জীবনে বেঁচে থাকার জন্য মানুষ নানা ধরনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এ প্রয়োজন মেটাতে মানুষ মানুষের পাশে এসে দাঁড়ায়। নিজ কর্মক্ষমতা অনুযায়ী একে অপরকে সাহায্য করে। এভাবে উভয়ে উভয়ের উপর নির্ভর করতে শেখে, একে অপরকে ঘনিষ্টভাবে চিনতে পারে, উভয়ের মধ্যে ভালবাসা ও মমতা গড়ে ওঠে। ফলে পরস্পর পরস্পরকে জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নেয়।

আধুনিক বিশ্বে প্রযুক্তির বিকাশ ঘটেছে। মানুষ প্রযুক্তি ব্যবহার করে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যোগাযোগ রাখছে। গড়ে উঠছে সম্প্রীতি, সৌহার্দ। সমাজকে এখন অনেক বৃহত্তর পরিমাপে ধারণা করা হয়। অর্থাৎ এ কথা বলা হয় পৃথিবীর সকল মানুষ এখন একটি সমাজের অন্তর্ভুক্ত। । দূর প্রান্তে বসেও মানুষ একে অপরের উপর নির্ভর করে এবং বিশ্বাস করে।

কাজ - এক

এ কাজটি করে আপনি সমর্মিতা, পারস্পারিক নির্ভরশীলতা ও আস্থা স্থাপন সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন এবং একে অপরের উপর নির্ভরশীল হতে কী বৈশিষ্ট্য প্রয়োজন হয় তা জানবেন।

আপনার পারিপার্শিকতার মধ্যে নির্ভর করতে পারেন এবং আস্থা রাখতে পারেন এমন একজন বন্ধু বা আত্মীয়ের খোঁজ করুন। এবার নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

১. নির্ভর করতে পারছেন এমন একজনের সাথে আপনার সম্পর্ক কী?
২. তার পাঁচটি সাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লিখুন।
৩. আপনি পছন্দ করছেন এমন তিনটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লিখুন।
৪. এ বৈশিষ্ট্যগুলো কীভাবে আপনাকে তার উপর নির্ভর করতে ও আস্থা স্থাপন করতে সাহায্য করবে?
৫. এবার আপনার চারটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লিখুন, যা আপনার বন্ধু বা আত্মীয়কে আপনার উপর নির্ভর করতে সাহায্য করবে বলে আপনার মনে হয়।

সহমর্মিতা

সহমর্মিতা উপলব্ধি করার একটি বিষয়। মানুষ যখন দুঃখ পায়, বিপদে পড়ে বা অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়ে তখন তার প্রতি আমরা সহমর্মিতা দেখাই। সহমর্মিতার সমার্থক আরও শব্দ হল সমবেদনা, সমব্যাথী, সহানুভূতি ইত্যাদি। মানুষের মনে তখনই সমবেদনা জাগে যখন অন্যের মনের দুঃখজনক অনুভূতি তার মন দিয়ে সে অনুভব করে। শুধু অনুভবই করে

না, সে এতটাই দুঃখ পায় যে দুঃখীজনকে সমবেদনা জানানোর জন্যে সে তার কাছে ছুটে যায় অথবা কাছে যাওয়া সম্ভব না হলে দূর থেকে তার দুঃখে সে ভেঙে পড়ে। তবে সহমর্মিতা যে সব সময় দুখীজনের জন্য হবে তা নয় বরং যে বিপদে পড়েছে বা অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়েছে তার জন্যেও হয়ে থাকে। যে কারণেই হোক না কেন সহমর্মিতা মানুষকে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর শক্তি যোগায়।

মেরিয়েন ওয়েবস্টার সহমর্মিতাকে এভাবে সঙ্গায়িত করেছেন, সহমর্মিতা এক ধরনের অনুভূতি যা আমরা হৃদয় দিয়ে বুঝতে পারি এবং দুঃখীজন বা সমস্যায় আক্রান্ত মানুষের পাশে থেকে তার অভিজ্ঞতা ও বেদনাভরা অনুভূতি আমরা ভাগ করে নিই।

সাধারণত আমরা যে মানুষকে পছন্দ করি বা যে আমাদের আত্মীয়, পরিবার-পরিজন বা বন্ধু স্থানীয় লোক তার প্রতি আমরা সহমর্মিতা প্রকাশ করি। তবে এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার যে আত্মীয়, পরিজন বা বন্ধু ছাড়া যে মানুষটি কল্যাণময়ী, দরদী বা পরোপকারী তার জন্যেই মানুষ সহমর্মিতা প্রকাশ করে। মানুষের মনে সহমর্মিতার বোধ জাগে বিভিন্নভাবে। নিচে এর কারণ উল্লেখ করা হলো।

সহমর্মিতার কারণ: মানুষ যখন অন্যের দুরবস্থার কারণ খুব গভীরভাবে মনোযোগ দিয়ে অনুভব করে এবং দুরবস্থার কারণ খুঁজে বের করতে পারে তখনই সে সহমর্মিতা অনুভব করে। এখানে সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তির প্রতি আমাদের মনোযোগী হওয়া খুব জরুরী। ব্যক্তি ও তার সমস্যার প্রতি পূর্ণ ও গভীর মনোযোগ আমাদের সহমর্মিতার বোধকে জাগিয়ে তোলে। যেমন, আপনার পাশের বাড়ির ছেলেটি রাস্তায় এ্যাকসিডেন্ট করে তার পা ভেঙে ফেলল। এ অবস্থায় ছেলেটির প্রতি আপনার সহানভূতি জাগবেকি? অবশ্যই জাগবে।

দেখা যায়, দুঃখ বা সমস্যার গভীরতার উপর সহমর্মিতার গভীরতাও নির্ভর করে। আবার নিকট জনের ব্যথা থেকে দূরের জনের ব্যথা আমরা কম অনুভব করি। আপনার নিজের সন্তান যদি কোন বিপদে পড়ে তবে অন্য যে কারও দুঃখ/কষ্ট থেকে আপনার সন্তানের কষ্ট আপনাকে অনেক বেশি সহানুভূশীল করে তুলবে। তার কষ্ট দূর করার জন্য আপনি প্রাণপাত চেষ্টা করবেন। আবার কোন মানুষ টাকা হারিয়ে ফেললে তার জন্যে আপনার যত সমবেদনা হবে, এ্যাকসিডেন্ট করে যার অঙ্গহানি হয়েছে তার প্রতি আপনার সমবেদনা অনেক বেশি হবে।

যোগাযোগ: সহমর্মিতা দেখানোর সবচেয়ে সহজ ও স্পষ্ট উপায় হলো যার প্রতি সহানুভূতি দেখান হচ্ছে তার সাথে কথা বলা। অর্থাৎ কথার মাধ্যমে সহমর্মিতা দেখানো। সহানভূতি দেখানোর সময় নানা ধরনের আবেগতাড়িত শব্দ ব্যবহার করে দুঃখবোধের গভীরতা বোঝানো হয়। যেমন, আহা, আহা রে, ওহ! ইত্যাদি। এসব শব্দ ব্যবহার ছাড়াও দুঃখের বা বিপদের কারণ বা পরিস্থিতি সম্পর্কে কোন আবেগতাড়িত কথা বলেও সমবেদনার মাত্রা বোঝানো যায়। যেমন, বাপ রে বাপ! কী ভয়ংকর! কী নিষ্ঠুর! কত মারাত্মক! ইত্যাদি।

কথা না বলে শুধুই কণ্ঠস্বরের ওঠানামা দিয়ে অন্যের দুঃখের প্রতি সমব্যাথা জানানো যায়। যেমন, আঃ----হ এভাবে সহমর্মিতা প্রকাশ করা যায়। অথবা মৌখিক অভিব্যক্তি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাড়িয়ে বা বিভিন্নভাবে শারীরিক স্পর্শ দ্বারাও সহমর্মিতা প্রকাশ করা যায়।

বিভিন্ন প্রকার মৌখিক অভিব্যক্তি

বিভিন্ন প্রকার মৌখিক অভিব্যক্তি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ইশারা শুধু মানুষের আবেগ প্রকাশ করে না, সেই সাথে তার মতামত, তার বোধগম্যতা, তার ক্লান্তি বা অবসাদও প্রকাশ করে। তবে সহমর্মিতা বোঝানোর জন্য সাধারণত মৌখিক অভিব্যক্তি বেশি ব্যবহৃত হয়। সহানভূতি প্রকাশের এই অভিব্যক্তিগুলো সব দেশে মানুষের প্রায় একই রকম। সমব্যাথি যে হয় তার সহমর্মিতা প্রকাশভঙ্গি অনেকক্ষেত্রে তার নিজস্বতার উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ সে যেমন বোধ করে তেমনই প্রকাশ করে।

পারস্পারিক নির্ভরশীলতা

পারস্পারিক নির্ভরশীলতা ঘটে তখনই যখন দুজন মানুষ একে অপরের উপর ঘনিষ্টভাবে নির্ভর করে। তাদের মধ্যে সম্পর্কটি এত ঘনিষ্ট হয় যে, মনে হয় তারা কখনই একজন অন্যজনকে ছেড়ে একা থাকতে পারবে না। তারা শারীরিকভাবে ভিন্ন থাকলেও মনের দিক থেকে একটি ঘনিষ্ট বন্ধন তৈরি করে। যেমন, প্রতিবেশীর সাথে ঘনিষ্টতা বা কর্মক্ষেত্রে কোন সহকর্মীর উপর নির্ভরশীলতা। কখনও কখনও প্রতিবেশির সাথে প্রতিবেশির এমনভাবে ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে ওঠে যে, সাংসারিক ও সামাজিক সব ব্যাপারে তারা একসাথে কাজ করেন। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে পারিবারিক ব্যাপারে উভয়ে পারস্পারিক আলাপ-অলোচনা ও সমঝোতার মাধ্যমে ব্যক্তিগত কোন সমস্যার সমাধান করেন বা সাংসারিক কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অন্যদিকে চাকরিক্ষেত্রেও এক সহকর্মী অপর সহকর্মীর উপর এমনভাবে নির্ভর করেন যে, মনে হয় তারা একে অপরকে ছেড়ে থাকতে পারবেন না। কর্মক্ষেত্র সম্পর্কিত যে কোন কাজে তারা একে অপরকে সাহায্য করেন, কর্মক্ষেত্রে যে কোন আনুষ্ঠানিক আয়োজনে তারা একসাথে থাকার চেষ্টা করেন, দুপুরের খাবার একসাথে খান, একসাথে যাতায়াত করার ব্যাপারেও তারা আগ্রহবোধ করেন, এমনিভাবে সব ব্যাপারে তারা একে অপরের পাশে থাকেন। সর্বোপরি এ কথা বলা যায়, তারা পরস্পরের মধ্যে বন্ধুস্থানীয় সম্পর্ক গড়ে তোলেন।

সমাজের অন্যান্যক্ষেত্রেও এ ধরনের সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে যদি দুজনের একে অপরের প্রতি ভালবাসা ও সহমর্মিতা থাকে। আমাদের সমাজে পারস্পারিক নির্ভরশীলতার সম্পর্ক গড়ে ওঠা খুবই প্রয়োজন। এর ফলে পারস্পারিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাবে এবং একইসাথে মানুষে মানুষে হিংসা, আক্রোশ কমে সমাজে শান্তি বিরাজ করবে।

পারস্পারিক নির্ভরশীলতার কারণঃ মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। তাই সে জন্মগতভাবে পরনির্ভরশীল এবং প্রয়োজনের বশবর্তী। এ ছাড়া মনুষ্য সমাজে সভ্যতা জন্মের আগে মানুষ পশুর মতই জীবনযাপন করত। তারা খাদ্য অন্বেষণে ঘুরত এবং ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে শিকার খুঁজে বেড়াত। এই দলগুলোর মধ্যে তারা পরস্পরের নির্ভরশীল হয়ে পড়ত। কারণ ভয়ংকর সব পশুদের আক্রমন থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য একে অপরের সাহায্যের প্রয়োজন হত। তাছাড়া প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য একে অপরকে সাহায্য করত।

সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে মানুষের স্বভাব ও অভ্যাসের পরিবর্তন হয় বটে, কিন্তু দলীয়করণ বা সম্প্রদায়ভূক্ত হওয়ার যে প্রবণতা তা রয়েই যায়। দেখা যায় একই জাতীয় কাজ করতে আগ্রহী ও করতে পারে এমন মানুষরা একটি সম্প্রদায়ভুক্ত হয়। এভাবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্ম হয় এবং এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের উপর বিভিন্নভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। কারণ বেঁচে থাকা ও জীবন পরিচালনার জন্য একই প্রকার কাজ করলে চলে না। বিভিন্ন প্রকার কাজের মধ্য দিয়ে জীবনের উপাদান সংগ্রহ করতে হয়। এটাই মানুষের সমাজবদ্ধতার ইতিহাস। একে অপরকে সাহায্য করার মধ্য দিয়ে পরস্পরের জন্য মমতা সৃষ্টি হয় এবং সহমর্মিতা মানুষকে মানুষের সাথে অদৃশ্য বন্ধনে বেঁধে রাখে।

শিশু জন্মের পর থেকে মা-বাবার উপর নির্ভরশীল হয়ে গড়ে ওঠে। এই নির্ভরশীলতা এতটাই জোরালো যে মায়ের অনুপস্থিতিতে শিশুর গড়ে ওঠা স্বাভাবিক হয় না। শিশুকে মা যে স্নেহমমতা দিয়ে লালন করেন সেখানেও মা শিশুর উপর নির্ভরশীল। শিশু না থাকলে মায়ের স্নেহ ব্যর্থ হয়। শিশু ধীরে ধীরে বড় হয়। সে নিজে হাঁটতে শেখে, অনুভব করতে শেখে, বলতে শেখে, এভাবে সে একজন পৃথক ও স্বতন্ত্র মানুষ তৈরি হয়। তখন বেঁচে থাকার জন্য মায়ের সাহায্য না হলেও চলে। কিন্তু পারস্পারিক স্নেহমমতা, সহমর্মিতা ও ভালবাসা দুজনকে কাছাকাছি রাখে, পরস্পর এক নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ থাকে।

লক্ষ্য করে দেখুন, পারস্পারিক নির্ভরশীলতার অন্যতম কারণ হল সহমর্মিতা। এর কারণে মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয় এবং সুস্থ ও স্বস্তিময় সমাজ গড়ে ওঠে। সমাজের বিভিন্নক্ষেত্রে পারস্পারিক নির্ভরশীলতা পাওয়া যায়। যেমন, বন্ধু বন্ধুর উপর নির্ভরশীল, ছাত্র শিক্ষকের উপর বা শিক্ষক ছাত্রের উপর নির্ভরশীল, স্বামী স্ত্রীর উপর বা স্ত্রী স্বামীর উপর

নির্ভরশীল। পারস্পারিক নির্ভরশীলতা সমাজে শান্তি স্থাপনের এক বিরাট উপাদান। নির্ভরশীলতার কারণে একের প্রতি অন্যের প্রেম ও ভালবাসা জোরালো হয়। উভয়ের মধ্যে সহজ সম্পর্ক বিরাজ করে । ধীরে ধীরে এ সম্পর্ক সমাজের সর্ব স্তরে ছড়িয়ে পড়ে।

আস্থা স্থাপন: আস্থা স্থাপনের অন্য নাম হল নির্ভর করা বা নির্ভরশীল হওয়া। এর অন্যতম শর্ত হলো বিশ্বাস স্থাপন। পারস্পারিক বিশ্বাস না থাকলে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। পারস্পারিক নির্ভরশীলতায় উভয়ের মধ্যে সুস্থ ও সহজ সম্পর্ক গড়ে ওঠে একথা ঠিক, কিন্তু সে সম্পর্কের মূলে রয়েছে বিশ্বাস। একে অপরকে বিশ্বাস করে বলেই তারা কাছাকাছি আসে, পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে সাহায্য নেয় এবং উভয় উভয়ের জীবনকে সুন্দর করে তোলে।

আপনি কোন মানুষকে বিশ্বাস করবেন তখন, যখন আপনি তার ভাল দিকটি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করবেন। তার মূল্যবোধ, তার কাজকর্ম অর্থাৎ সে কী কাজ করতে ভালবাসে, কাজটি সে কী উপায়ে করে ইত্যাদি সম্পর্কে আপনার জানা থাকবে। তার ইতিবাচক দিকটির প্রতি আপনি ঝুঁকে পড়বেন এবং তাকে ভালবাসবেন। এই ভালবাসাই আপনাকে বিশ্বাস স্থাপনে সক্ষম করে তুলবে। ফলে আপনি তার উপর আস্থা রাখতে পারবেন।

চাকরি ক্ষেত্রে আপনি আপনার সহকর্মীর উপর বা বড়কর্তার উপর বা স্কুলে প্রধান শিক্ষকের উপর আস্থা রাখতে পারবেন যদি আপনি জানেন তিনি কেমন ধরনের মানুষ। সে কারণে একজন মানুষকে বিশেষভাবে চেনা আস্থা স্থাপনের অন্য আর একটি শর্ত। এমন যদি হয় যে তিনি সৎ, উদার ও উন্নত নৈতিক চরিত্রসম্পন্ন মানুষ, কিন্তু তিনি হঠাৎ রেগে যান এবং তার ক্রোধ অত্যন্ত ভয়ংকর। এ অবস্থায় তার ক্রোধ আপনাকে তার থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে। তার প্রতি আস্থা স্থাপন তো দূরের কথা, তার কাছে যেতে আপনি ভয় পাবেন।

উন্নত সমাজ গড়ে তুলতে পারস্পারিক সহমর্মিতা যেমন প্রয়োজন, একে অপরের উপর আস্থা স্থাপনও প্রয়োজন। সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে সহমর্মিতা বিরাজ করবে, একে অপরের উপর নির্ভরশীল হবে ও পরস্পর পরস্পরের উপর আস্থা স্থাপন করতে পারবে, আসুন এমন সমাজ গড়ে তোলার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করি ও প্রতিজ্ঞা করি।

কাজ-দুই

এ কাজটি করে আপনি সমাজে সমর্মিতা, পারস্পারিক নির্ভরশীলতা ও আস্থা স্থাপনের বাস্তব ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে পারবেন এবং নিজ জীবনে তা প্রয়োগ করতে পারবেন। কাজটি করতে আপনার ১৫ থেকে ২০ দিন সময় লাগবে।

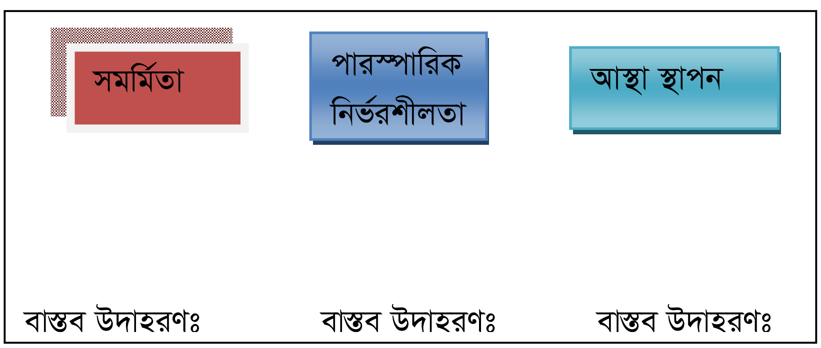

উপরে চিত্র অনুসারে হলুদ বর্ণের একটি বড় পোস্টার পেপার নিন। হলুদ বর্ণ ছাড়া তিনটি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ছোট কাগজ নিন। পৃথক তিনটি কাগজে সমর্মিতা, পারস্পারিক নির্ভরশীলতা ও আস্থা স্থাপন লিখুন (চিত্র অনুযায়ী)। এবার কাগজ তিনটি পোস্টার পেপারের উপর আঁঠা দিয়ে পাশাপাশি লাগান। ১৫ থেকে ২০ দিন সময় নিয়ে আপনার পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে উপরের তিনটি বিষয়ের বাস্তব উদাহরণ খোঁজ করুন। প্রত্যেকটি উদাহরণ পোস্টার পেপারে লাগানো তিনটি বিষয়ের নিচে চিত্রানুযায়ী লিখুন। সম্পূর্ণ কাজটি এবার আপনার শিক্ষক ও সহপাঠিদের দেখান।

সারসংক্ষেপ

মূল শিখনীয় বিষয়

সমাজে বসবাস করতে হলে মানুষকে মানুষের উপর নির্ভর করতে হয়। একে অপরের প্রয়োজন মেটাতে, চাহিদা মেটাতে, পরস্পরের বিপদে বা আনন্দে মানুষ পাশাপাশি আসে এবং একে অপরকে চিনতে পারে। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা, সহমর্মিতা ও বন্ধুত্ব জন্ম নেয়। তখন তারা একে অপরের উপর আস্থা স্থাপন করে এবং সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য উভয় উভয়কে সাহায্য করে। পারস্পারিক সহমর্মিতা ও নির্ভরশীলতা গড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজন

- একে অপরের উপর বিশ্বাস
- পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধা
- আত্মসচেতনতা
- অপরকে চিনবার ইচ্ছা
- সামাজিক হয়ে ওঠা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সহমর্মিতা দেখানোর সহজ উপায় কোনটি?
ক. ব্যক্তির সাথে কথা বলা
খ. ব্যক্তির সামনে কান্নাকাটি করা
গ. ব্যক্তির সামনে দুঃখ প্রকাশ করা
ঘ. ব্যক্তির সাথে ভদ্র ব্যবহার করা।

২। পারস্পারিক নির্ভরশীলতায় যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তার মূলে রয়েছে
ক. আস্থা
খ. নির্ভরতা
গ. বিশ্বাস
ঘ. ভালবাসা।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। সহমর্মিতা, পারস্পারিক নির্ভরশীলতা ও আস্থা স্থাপনের মধ্যে সম্পর্ক রচনা করুন।
২। মানুষ কখন একে অপরের উপর নির্ভরশীল হতে পারে? - আপনার উত্তরটি ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৮ : ১. ক ২. গ

পাঠ-৩.৯ সময়ানুবর্তিতা, নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধ গঠন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সময়ানুবর্তিতা, নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধ গঠন কী তা বলতে পারবেন;
- সময়ানুবর্তিতা, নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- সময়ানুবর্তিতা, নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধ গঠন করতে পারবেন।

মানুষ নিয়ম মেনে চলতে পছন্দ করে। কারণ যে কোন কাজে নিয়ম অনুসরণ করলে কাজটি সহজ ও পরিচিত হয়ে যায়। তখন সে সেই পরিচিত পথে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করে। অজানাকে সবাই ভয় পায়। যাকিছু অচেনা, দুর্বোধ্য, জটিল তা মানুষ গ্রহণ করে না। সকালে ঘুম থেকে ওঠা থেকে শুরু করে রাতে ঘুমতে যাওয়া পর্যন্ত সব কাজেই মানুষ ঘড়ি ধরে নিয়ম মেনে চলতে ভালবাসে। এভাবেই সে একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন অভ্যাস গড়ে তোলে। কিন্তু সব সময় মানুষ সময় মেনে বা নিয়ম মেনে চলতে পারে না। প্রাত্যহিক জীবনের নানা ধরনের প্রতিকূলতা তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে থাকতে বাধা দেয়। তখন যদি সে পিছিয়ে পড়ে বা অনিয়মের অভ্যাস করে তবে জীবনে অনেক জটিলতা দেখা দেয়, যা তার সুস্থ ও সাবলীল জীবনের প্রতি হুমকি স্বরূপ। সে কারণে যত প্রতিকূলতাই থাকুক না কেন শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন পরিচালনা প্রতিটি মানুষের অবশ্য কর্তব্য।

কাজ - এক

আপনি কী নিজেকে শৃঙ্খলাবোধসম্পন্ন একজন নাগরিক মনে করেন? উত্তর যদি হাঁ হয় তবে আপনার কোন কোন গুণাবলি আপনাকে শৃঙ্খলাবোধসম্পন্ন হতে সাহায্য করেছে, নিচের তালিকা থেকে তা নির্বাচন করুন। তালিকার অতিরিক্ত কোন গুণ থাকলে তা লিখুন।

উত্তর যদি না হয় তবে শৃঙ্খলাবোধসম্পন্ন একজন নাগরিক হয়ে ওঠার জন্য আপনি কীভাবে প্রচেষ্টা করবেন তা বিস্তারিত লিখুন এবং কোন কোন গুণাবলি আপনাকে এমন একজন নাগরিক হয়ে উঠতে সাহায্য করবে তার একটি তালিকা তৈরি করুন।

শৃঙ্খলাবোধসম্পন্ন নাগরিকের জন্য প্রয়োজনীয় গুণাগুণের তালিকাঃ

সৎ, নিষ্ঠাবান, ধৈর্য্যবান, আরামপ্রিয়, নিয়মানুবর্তী, সৌখিন, আধুনিক, পরনির্ভরশীল, দেশপ্রেমিক, ইতিবাচক মনোভাবাপন্ন, আত্মভোলা, কষ্টসহিষ্ণু, জ্ঞানী, আত্মকেন্দ্রিক, সময়ানুবর্তী, চালাক, বুদ্ধিমান, বিদ্যানুরাগী, কর্মবিমুখ, অস্থির।

সময়ানুবর্তিতা কী?

কোন কাজ সময়ের মধ্যে শুরু করা এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করাকে সময়ানুবর্তিতা বলে। সময়ানুবর্তিতা এক ধরনের অভ্যাস। সময়ের কাজ সময়ের মধ্যে করার অভ্যাস যদি একবার কোন মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে দেখা যায় সে সব সময় সব কাজেই সময় মেনে চলছে। যেমন, কেউ যদি কারও সাথে দেখা করতে যাওয়ার জন্যে সময় স্থির করে দেয় তবে সে ঐ সময়েই দেখা করার জন্য প্রাণপন চেষ্টা করে। প্রয়োজন হলে সে জন্য সে সময়ের অনেক আগে

যেয়ে বসে থাকে, তবু সময় ঠিকমত অনুসরণ করে। সময়ের কাজ সময়ে করা বা সময়ানুবর্তিতা মেনে চলা একটি উন্নত ও আধুনিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্য মানুষকে অনেক সুখী ও সমৃদ্ধশালী করে তুলতে পারে।

সময়ানুবর্তিতা প্রয়োজন কেন?

সময়ানুবর্তিতা সততাকে শক্তিশালী করে। যদি আপনি কাউকে কথা দেন যে, আপনি তার সাথে বেলা ৩টায় দেখা করবেন। তার মানে আপনি তার সাথে ৩টায় দেখা করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করলেন। কিন্তু যদি আপনি ৩:১৫টায় তার সাথে দেখা করতে যান, তবে আপনি আপনার কথা রাখতে পারলেন না। অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা ভাঙলেন। কিন্তু যদি সঠিক সময়ে দেখা করতেন, তবে তিনি মনে করতেন যে, ”না, ভদ্রলোক তার কথা রেখেছেন, তার কথার দাম আছে, তার কথার উপর আস্থা রাখা যায়।” এটা কী আপনার সম্মান অনেক বাড়িয়ে দেয় না?

সময়ানুবর্তিতা মানুষকে নির্ভরযোগ্য করে তোলে। জীবনের সব ক্ষেত্রে আপনি সময়ের কাজটি যদি সময়ে করেন মানুষ আপনার উপর নির্ভর করবে। আপনি যদি বলেন যে, অমুক সময়ে আপনি কাজটি শেষ করে রাখবেন তবে লোকে আপনার কাছে ঐ সময়েই যাবে কাজটি নেয়ার জন্যে। কারণ তারা জানে আপনার কথার মূল্য আছে।

সময়ানুবর্তিতা মানুষের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়। সময় মেনে চললে শুধুই যে অন্য মানুষ আপনার উপর নির্ভর করবে তা নয়, আপনি নিজেও আপনার নিজের উপর নির্ভর করতে শিখবেন। অর্থাৎ আপনার নিজের উপর বিশ্বাস বেড়ে যাবে। কোন কাজ হাতে নিয়ে আপনি বলে দিতে পারবেন যে, কাজটি করতে আপনার কত সময় লাগবে বা কত সময় আপনি নেবেন।

সময়ানুবর্তিতা নিজেকে চিনতে সাহায্য করে। মনে করুন আপনার নিজের জন্য কিছু সময় দরকার। নির্দিষ্ট কোন কাজ শেষে আপনি পর্যাপ্ত সময় নিজের জন্যে রাখতে পারবেন, যদি সময়ের কাজটি সময়ে করেন। অর্থাৎ আপনি পূর্ব থেকে বলে দিতে পারেন যে, অমুক সময়টি আপনি নিজের জন্য রাখবেন।

সময়ানুবর্তিতা মানুষকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে তোলে। সময়ানুবর্তী মানুষ প্রতি কাজেই সময় মেপে চলে। নির্ধারিত সময়ে তার কাজ শেষ হয়ে যায়। ফলে বাকী কাজ করার জন্য পর্যাপ্ত সময় হাতে থাকে। সুশৃঙ্খলভাবে সে প্রতিটি কাজ করতে পারে। তাড়াহুড়োর প্রয়োজন হয় না। তাছাড়া তাড়াহুড়োয় কাজে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

সময়ানুবর্তিতা মানুষকে বিনয়ী করে তোলে। মানুষ যখন কাজের চাপে নিজেকে বিশৃঙ্খল করে রাখে তখনই সে অন্যের সাথে খারাপ ব্যবহার করে। কিন্তু সুশৃঙ্খল মানুষ শান্তিপ্রিয় হয়, অন্যের সাথে সে ভাল ব্যবহার করে।

কথায় বলে সময় অর্থের সমতুল্য। হাতে যদি পর্যাপ্ত সময় থাকে তবে আরও বেশি অর্থোপার্জনে সে সময় ব্যয় করা যায়। যেমন, আপনি আপনার অফিসের কাজ যথাসময়ে শেষ করলেন এবং নির্ধারিত সময়ে মুক্তমনে বাড়ি ফিরে এলেন। এ সময় আপনার মানসিক কোন চাপ নেই। আপনি ঘরে বসে অন্য কোন কাজ করে আরও বেশি অর্থ উপার্জন করতে পারেন। এভাবে সচ্ছলতা ফিরিয়ে এনে সুখী ও সুস্থ একটি পরিবার গড়ে তুলতে পারেন।

সময়ানুবর্তী হবেন কীভাবে?

অফিসে বা কাজের কোন জায়গায় দেরী করে উপিস্থিত হলে অন্যের নানারকম প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। কেন দেরী হল? কী হয়েছে? কোথায় গিয়েছিলেন? ইত্যাদি। তা আপনার জন্যে লজ্জার বিষয়। কিন্তু সময়ানুবর্তী হওয়া সহজ কথা না। তার জন্য রীতিমত প্রচেষ্টা চালাতে হয়। যদি আপনি প্রতিনিয়ত আপনার স্বভাব বা অভ্যাসের পরিবর্তন আনেন এবং সময়ের কাজ সময়ের মধ্যে করার চেষ্টা করতে থাকেন তবে আপনি সফল হবেনই। আসুন দেখি, কী উপায়ে সময়ানুবর্তী হওয়া যায়।

- সকালে কাজে বের হওয়ার সময় সাথে যা কিছু নেয়া প্রয়োজন হবে যেমন, আপনার মোবাইল ফোন, ঘড়ি, চাবি, ব্যাগ বা অন্য আর কিছু অথবা আপনার পোশাক যা আপনি পরে বেরোবেন, তা আগের দিন রাতে গুছিয়ে হাতের কাছে রাখুন।
- কাউকে কোন কথা বলার হলে বা সকালে কোন কাজ করতে হলে সে কাজ করতে সময় কত লাগবে তা মেপে নিয়ে ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠুন, যেন পর্যাপ্ত সময় হাতে পাওয়া যায়।

- সকালে কী খাবেন বা কাকে কী খেতে দেবেন, তা আগের দিন রাতে ভাবুন। প্রয়োজন হলে খাবার তৈরি করে রাখুন। ফ্রিজে রাখুন বা সকালে গরম করে নিন।
- ঘরের সকল জিনিস নির্দিষ্ট জায়গায় রাখুন। যেমনঃ কলম, বইখাতা, জুতো, জামাকাপড়, ব্যাগ, রান্নাঘরের জিনিসপত্র, তোয়ালে বা গামছা, আপনার বা পরিবারের অন্যান্যদের কাপড়চোপড় ইত্যাদি। যেন সেখানে হাত দিলেই নির্দিষ্ট জিনিসটি পাওয়া যায়। সারা ঘর ভরে বিভিন্ন জিনিসপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখবেন না।
- কাজের জায়গায় পৌঁছে যেন কৈফিয়ত দিতে না হয়, রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম ছিল বা সকালে বৃষ্টি হচ্ছিল, বের হতে পারিনি ইত্যাদি। এ জন্য যথেষ্ট সময় হাতে নিয়ে বের হবেন। সব সময় ভাববেন ট্রাফিক জ্যাম থাকবেই বা বৃষ্টি হতেই পারে, এগুলো খুব স্বাভাবিক ব্যাপার, তার জন্য আপনার যেন দেরী না হয়ে যায়।
- নিজের কাছে নিজে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'ন যে কোন জায়গায় আপনি নির্ধারিত সময়ের অন্তত ১৫ মিনিট আগে উপস্থিত হবেন, তা সে যতই বাধা আসুক না কেন। সেইমত নিজেকে প্রস্তুত করুন এবং কাজ করুন।
- অনেক সময় নতুন কোন জায়গায় যেতে কত সময় লাগবে তা ধারণায় থাকে না। সেক্ষেত্রে পূর্বে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারেন কত সময় লাগবে বা কীভাবে যাবেন ইত্যাদি।
- ইংরেজীতে একটি কথা আছে, Early to bed and early to rise, Makes a man healthy, wealthy and wise. অনেকেই আছেন যারা অনেক রাতে ঘুমাতে যান, ফলে সকালে উঠতে দেরী হয়ে যায়। সুস্থ ও সুন্দর জীবন যদি চান তবে অবশ্যই রাতে ১০টা থেকে ১১টার মধ্যে ঘুমুতে যাবেন এবং যত তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠা সম্ভব ও প্রয়োজন উঠবেন।
- আপনার চারপাশের অনেকেই হয়তো দেরী করে তাদের কাজ শুরু করেন। যেমন, শিক্ষকদের ক্লাসে দেরী করে আসা, শিক্ষার্থীদের দেরী করে ক্লাসে ঢোকা, কর্তা মহোদয়ের কোন মিটিং দেরী করে শুরু করা, নির্ধারিত সময়ের অনেক দেরীতে বাস ছাড়া ইত্যাদি। আপনি এসব দিকে মনোযোগ দেবেন না। আপনার সময় আপনি রক্ষা করুন এবং আপনার যিনি সহযাত্রী বা সহকর্মী তাকেও সময়ানুবর্তিতা মেনে চলায় উদ্বুদ্ধ করুন।

সময়ানুবর্তিতাকে আপনি আপনার জীবনে একটি মূল্যবোধ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করুন। আপনার পরিবারের সকলের মধ্যে এই মূল্যবোধ গড়ে তোলার জন্য প্রত্যেককে উদ্বুদ্ধ করুন।

নিয়মানুবর্তিতা

দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়ম-কানুন অনুসরণ করা বা মেনে চলাকে নিয়মানুবর্তিতা বলে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে যথাযথ নিয়ম মেনে চলা মানুষের জীবনে এক ধরনের মূল্যবোধ। কোন প্রতিষ্ঠানে বা ঘরে প্রচলিত নিয়ম যদি সবাই একসাথে মেনে চলে তবে প্রতিষ্ঠানটি সুষ্ঠু নিয়মে চলবে এবং তার ফলাফল হবে প্রত্যাশিত। প্রতিষ্ঠান যদি সুষ্ঠু নিয়মে চলে তবে প্রতিষ্ঠানেরই শুধু লাভ নয়, তার সাথে যারা সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ সেখানে যারা কাজ করেন তাদের জীবনও সুখ ও ঐশ্বর্যে ভরে উঠবে। শিশুকালে পরিবার থেকেই নিয়মানুবর্তিতার অভ্যাস করতে হয়। পরে মানুষ যত বড় হয় নিয়মানুবর্তিতার অভ্যাস তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। প্রতিষ্ঠানের মত একটি পরিবারেও যদি সবাই পারিবারিক নিয়মনীতি মেনে চলে তবে সে পরিবার সুখী ও সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে।

নিয়মানুবর্তিতা প্রয়োজন কেন?

নিয়মানুবর্তিতা মানুষকে নিজের প্রতি আস্থাবান করে তোলে। মনে করুন, একজন লোক যেখানেই যান তিনি নিয়ম মেনে চলেন। তিনি যখন বাসে ওঠেন তখন লাইন দিয়ে দাঁড়ান, তাতে তিনি বিরক্ত হন না, বরং স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন। ফলে অযথা হুড়োহুড়ি না করে নির্বিঘ্নে বাসে উঠতে পারেন এবং বসার জন্য একটি জায়গাও পান। এভাবে তিনি দেখেছেন নিয়ম মেনে চললে যা তিনি চান তা পাওয়া যায়।

নিয়মানুবর্তিতা মানুষের ভিতরে শৃঙ্খলাবোধ প্রতিষ্ঠিত করে। প্রকৃতপক্ষে নিয়মানুবর্তিতার অপর নাম শৃঙ্খলা। যে ব্যক্তি নিয়ম মেনে চলে তার জীবন সুশৃঙ্খল হয়ে উঠবেই। কারণ নিয়ম অনুসারে তিনি ধারাবাহিকভাবে প্রতিটি কাজ সম্পন্ন

করেন। দুপুরে খাওয়ার আগে গোসল করেন, কখনই খেয়ে উঠে গোসল করেন না। সুতরাং খাদ্য হজমে তার কখনও কোন গোলমাল হয় না।

যিনি নিয়ম মেনে চলেন তিনি স্বার্থহীন উদার ব্যক্তিত্বের অধিকারী হন। নিয়মের বশবর্তী মানুষ নিজের সুবিধার কথা ভাবেন না। নিয়ম মেনে চলার পর তিনি যেটুকু পান সেটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকেন। অন্যের সাথে ভাগ বাটোয়ারা করে চলার নিয়মে তিনি অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। এভাবে তার চরিত্রে স্বার্থহীনতা গড়ে ওঠে।

নিয়মানুবর্তী মানুষ অন্যের মুখাপেক্ষী হন না। নিয়মানুবর্তী মানুষ সময়ানুবর্তীও বটে। যেমন, একজন মানুষ যিনি প্রতিদিন সকাল ৬:০০টায় ঘুম থকে ওঠেন এবং রাত সাড়ে ১০:০০টায় ঘুমতে যান। এখানে একইসাথে তিনি নিয়ম ও সময় দুটোই মেনে চলছেন। সময় মেনে চলা নিয়মের একটি অঙ্গ। যিনি নিয়ম ও সময় দুটোই মেনে চলেন তিনি নিজের কাজ নিজেই করতে পারেন। অন্যে কখন করে দেবে সে জন্য তাকে বসে থাকতে হয় না। এভাবে তিনি সাবলম্বী হন।

নিয়মানুবর্তিতা মানুষকে সততার উপর নির্ভর করতে শেখায়। কোন কাজ নিয়মানুসারে সম্পন্ন করার অর্থ হল সততার অনুসরণ করা। কারণ কাজটি তিনি নিয়ম ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে করেননি, যা অনিয়ম, অন্যায়। মনে করেন আপনার কর্ম প্রতিষ্ঠানে একটি নিয়ম হল প্রতিদিন সকাল ৯:০০টার মধ্যে উপস্থিত হয়ে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করা। আপনার একজন সহকর্মী প্রতিদিন দু/এক ঘণ্টা দেরী করে আসেন এবং হাজিরা খাতায় ৯:০০টার ঘরেই স্বাক্ষর করেন। তিনি শুধু অনিয়মই করেন না, অন্যায়ও করেন।

দৈনন্দিন কাজে যথাযথ নিয়ম মেনে চললে কাজটি সুসম্পন্ন হয়। কাজটি ফেলে রাখার বা জটিল অবস্থায় চলে যাওয়ার কোন ভয় থাকে না। কোন কাজে যদি অনিয়মে জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়, তবে যিনি কাজটি করছেন তার মানসিক অবস্থাও জটিল ও অস্থির হয়ে ওঠে। তিনি কাজটি শেষ করার কোন পথ পান না। তখন ভিন্ন উপায়ে কোন মতে শেষ করতে হয়। এ অবস্থা তাকে স্বস্তি দেয় না। তাই সুখ ও শান্তি পেতে হলে নিয়ম অনুসরণ করা উত্তম।

সকলের মঙ্গলের জন্য নিয়ম পালন করুন। অনেক সময় দেখা যায় নিয়ম পালন করে কাজ করলে কাজে দেরী হয়ে যাচ্ছে। অনেকে সে জন্যে ভিন্ন পথে কাজ করেন। এ ব্যাপারটি কখনই প্রত্যাশিত না। কারণ সামান্য দেরী হলেও এক নিয়মে কাজ করলে সকলের মধ্যে একটি সুষম কর্মবিন্যাস তৈরি হয়। যার ফল সকলে সমানভাবে ভোগ করে। অর্থাৎ সবাই লাভবান হয়।

নিয়মানুবর্তী হবেন কীভাবে?

কোন কাজে নিয়মানুবর্তী হওয়ার পূর্বের কাজ হল কাজটির নিয়ম জানা। যেমন, আপনার অফিসে বা ব্যবসায় ক্ষেত্রে কাজ শুরু করার আগেই জেনে নিতে হবে এখানে কী কী নিয়ম ও বিধি প্রচলিত আছে। সেসব নিয়মনীতি জানুন ও অনুসরণ করুন। অথবা আপনার ঘরে শিশুদের শেখানোর জন্য ও নিয়ম পালনে অভ্যস্ত করে তোলার জন্য নিয়ম প্রবর্তন করুন। এ ব্যাপারে গৃহের অন্যান্য সদস্য যেমন আপনার স্ত্রী/স্বামী, বয়স্ক কোন ব্যক্তি যেমন মা-বাবা বা অন্য কোন গুরুজন বা সদস্যদের সাথে মত বিনিময় করে নিয়মকানুন স্থির করুন। এমনভাবে নিয়ম প্রচলন করুন যেন প্রত্যেকেই তা পালন করতে পারে। নিয়ম পালনে কারও কোন প্রকার অসুবিধা না হয়। যেমন, খুব সকালে ঘুম থেকে উঠলে আপনার মায়ের শরীর খারাপ হয়। অতএব তার জন্য একটু দেরী করে ঘুম থেকে ওঠার নিয়ম প্রচলন করতে হবে।

ঘরে বা গৃহে বিভিন্ন জনের সুবিধা অনুযায়ী নিয়ম প্রচলন করা যায়, কিন্তু কর্ম প্রতিষ্ঠানে এটি সম্ভব না। এখানে সকলের জন্য এক নিয়ম প্রচলন করাই সুবিধাজনক। কর্ম প্রতিষ্ঠানে বৈষম্য করা ঠিক না। এখানে সকলের জন্য এক নিয়ম থাকলে কারও মধ্যে অসন্তুষ্টি জন্ম নেয় না। বরং সকলের সাথে এক হয়ে নিয়ম পালন করার ঝোঁক দেখা যায়।

- নিয়ম পালন করে কাজ করে নিয়মানুবর্তিতার অভ্যাসটি গড়ে তুলুন।
- নিজের কাছে নিজে প্রতিজ্ঞা করুন যতই অসুবিধা হোক না কেন নিয়মের বাইরে আপনি এক পাও চলবেন না।
- আপনার নিকটজনের মধ্যে অনেকেই আপনার সমালোচনা করতে পারেন। তাদের কথায় কান না দিয়ে, তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করুন যে আপনার পথটি সঠিক। এর ফলে আপনি যা পাবেন সেটাই আপনার লাভ। নিয়ম অনুসরণ না করলে সবটুকু ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

সমাজের যেসব নিয়ম মানব কল্যাণ আনতে পারে সেদিকে নজর দিন। নিয়মানুবর্তিতা অনুসরণ করার ফাঁকে জনসেবায় অংশ নিন।

শৃঙ্খলা কী?

ব্যক্তির আচরণের নিয়ম ও বিধির অনুসরণকে শৃঙ্খলা বলে। অর্থাৎ আমরা এতক্ষণ যে নিয়মনীতি অনুসরণ নিয়ে আলোচনা করেছি তার অপর নাম শৃঙ্খলা। মানুষের মধ্যে এই শৃঙ্খলা সম্বন্ধে ধারণা জন্ম নেয়াকে শৃঙ্খলাবোধ বলে। শৃঙ্খলাবোধসম্পন্ন মানুষ নিজের আচরণ ও অনভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সে নিজের মধ্যে কোন দুর্বলতা বা অন্যায় কোন কাজকে গ্রাহ্য করে না। শৃঙ্খলাবিহীন জীবন অস্থির ও অশান্তিময়। সে কারণে শিশুকাল থেকেই মানুষকে শৃঙ্খলা শিক্ষা দেয়া দরকার।

শৃঙ্খলাবোধের প্রয়োজনীয়তা

জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য মানুষের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ জন্ম নেয়ার প্রয়োজন আছে। ঘরে, অফিসে,মাঠে বা রাস্তায় যেখানেই আপনি থাকুন না কেন শৃঙ্খলাবোধ সব জায়গাতে কাজে লাগে। যেমন, রেফারি বাঁশি বাজালে খেলোয়াড়রা মাঠে নামে। কেউ যদি আগেই মাঠে নেমে পড়ে, তাহলে বলতে হবে তার শৃঙ্খলাবোধ নেই। অন্যদিকে অফিসের চেয়ারে পা তুলে বসা শুধু অভদ্রতাই নয়, শৃঙ্খলা বহির্ভুত কাজও বটে। আমরা দেখেছি ফুলের কুঁড়ি ফুঁটে সম্পূর্ণ ফুল হয়। প্রকৃতিতে এটা একটি শৃঙ্খলা। এভাবে সমাজে বা গৃহে সর্বত্র নির্দিষ্ট বিধি ও নিয়ম আছে যা মেনে চলতে হয়। তবেই শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন পাওয়া যায়।

নিয়মনীতির মত শৃঙ্খলাবোধও জন্ম নেয়ার জন্য শিশুকালই উৎকৃষ্ট সময়। এ সময় বাবামায়ের কাছ থেকে যে শৃঙ্খলা সে শিখবে তাই পরবর্তী বৃহৎ জীবনে তা কাজে লাগাবে। এ সময় সে শেখে পরিবারের বড়দের সম্মান করতে হয়, সব সময় সবার কাছে সত্যি কথা বলতে হয়, কোন খাবার সকলে সমান ভাগ করে খেতে হয়, সকালে ঘুম থেকে উঠে দাঁত ব্রাশ করতে হয় ইত্যাদি। ভেবে দেখুন এ অভ্যাসগুলোই বড় হয়ে আমরা সকলে পালন করে চলি। এগুলোই শৃঙ্খলা, যা সমাজে প্রয়োগ করলে সর্বত্র শান্তি বিরাজ করতে থাকে। সুতরাং শান্তি কামনার প্রথম শর্ত হল শৃঙ্খলাবোধ জন্ম দেয়া।

শৃঙ্খলাবোধের অভাবে মানুষ পশুর মত লক্ষ্যহীন জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। আমাদের দেশে ইদানিংকালে মানুষের ভিতর ভয়ানক অস্থিরতা কাজ করে। সর্ব স্তরের মানুষই অন্যায় ও অমঙ্গলের কাজ করতে দ্বিধা করে না, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি সবখানেই বিরাজ করছে। মানুষে মানুষে সংঘর্ষ, ঝগড়া, বিবাদ লেগেই আছে। এর প্রধান কারণ শৃঙ্খলাবোধের অভাব। শৃঙ্খলাবোধ থাকলে মানুষ নিয়ম ও নীতি মেনে সব কাজ করে। ফলে সবখানে মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়।

শৃঙ্খলাবোধ জন্ম নেয়ার উপায়

অশিক্ষা শৃঙ্খলাবোধ জন্ম নেয়ার একটি প্রধান অন্তরায়। অশিক্ষিত পরিবারে কোন শৃঙ্খলা থাকে না, সেখানে শিশুরাও কোন শৃঙ্খলা শেখে না। এ ধরনের পরিবার থেকে অধিকাংশ শিশু বিদ্যালয় যায় না। ফলে বিদ্যালয়ে যাওয়া এবং সেখানে যে শৃঙ্খলা শিক্ষা হয় তা থেকে তারা বঞ্চিত হয়। এভাবে অধিকাংশ মানুষের যে সমাজ সেখানে শৃঙ্খলাবোধ জন্ম নেয়ার কোন সুযোগই থাকে না। তাই শৃঙ্খলাবোধ জন্ম দেয়ার জন্য মানুষকে যথার্থ শিক্ষা দিতে হবে।

মানুষের যদি যথাযথ কাজ না থাকে তবে তার মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ দূর হয়ে যায়। সে কারণে শৃঙ্খলাবোধ শুধু জন্ম নিলেই হয় না, তা প্রয়োগের জায়গা থাকতে হবে। যে শৃঙ্খলা মানুষ গৃহে বা বিদ্যালয়ে শিখবে তা ক্রমে বড় হয়ে সমাজে ও তার কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করবে। শৃঙ্খলাবোধ প্রয়োগের জায়গা না পেলে ব্যক্তি ক্রমশ: হতাশ হয়ে পড়ে এবং তার ভিতর অস্থিরতার জন্ম হয়। তখন সে ধংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয়। সমাজ নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং মানুষের ভিতর শৃঙ্খলাবোধ জন্ম দিয়ে সুশৃঙ্খল সমাজ গঠন করতে হলে মানুষকে তার উপযুক্ত কাজ দিতে হবে। যা দিয়ে সে তার অমূল্য সময় কাটাবে এবং অর্থ উপার্জন করবে ও আনন্দ পাবে।

মানুষের ভিতর শৃঙ্খলাবোধ জন্মাতে হলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। দেশে জনসংখ্যা বেশি থাকলে স্কুল-কলেজ, হাটবাজার, অফিস আদালত সব জায়গাতেই মানুষের ভীড় লেগে থাকে। সবখানেই চীৎকার, চেঁচামেচি, হৈ হট্টোগোল শোনা যায়। কোন কাজ সুশৃঙ্খলভাবে করতে অসুবিধা হয়।

দারিদ্র শৃঙ্খলাবোধ গঠনে অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। মানুষ দারিদ্রের সাথে সংগ্রামে লিপ্ত হলে তার মন সব সময় অস্থির থাকে। কোন কাজে শান্তি পায় না। সেখানে শৃঙ্খলা রক্ষার তো কোন প্রশ্নই আসে না। তাছাড়া মানুষ দরিদ্র থাকলে শিক্ষা গ্রহণ ব্যহত হয়। আমরা আগেই জেনেছি অশিক্ষা শৃঙ্খলাহীনতার অন্যতম কারণ।

কাজ - দুই

আপনি কীভাবে সময়ানুবর্তিতা ও নিয়মানুবর্তিতা অনুসরণ করে নিজের জীবনে শৃঙ্খলাবোধ গঠন করবেন তার একটি পরিকল্পনা করুন।

সারসংক্ষেপ

মানুষ যখন বৃহত্তর সমাজ তথা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে তখন তার সুঅভ্যাসগুলো কর্ম প্রতিষ্ঠানকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে সাহায্য করে। সময়ানুবর্তিতা, নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলাবোধ এ সবই উন্নত চরিত্র গঠনের এক একটি শক্তিশালী উপাদান। এসব উপাদানের সমন্বয়ে যদি মানুষের মধ্যে ইতিবাচক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত করা যায় তবে মানুষের দ্বারা এক সুখী সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব হবে। সেখানে মানুষ নিজে সুখী হবে ও তার কর্মক্ষেত্রে শান্তি বিরাজ করবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোন ভাল অভ্যাস মানুষের উপর কীরূপ প্রতিক্রিয়া করে ?

ক. মানুষকে বশবর্তী করে　　খ. মানুষকে তার দাস বানায়

গ. মানুষকে সুস্থ জীবন দেয়　　ঘ. মানুষকে সামাজিক করে।

২। ইদানিংকালে মানুষের ভিতর যে অস্থিরতা কাজ করে তার প্রধান কারণ–

ক. মানুষে মানুষে সংঘর্ষ　　খ. মানুষের শৃঙ্খলাবোধের অভাব

গ. বিজ্ঞানের নিত্যনতুন আবিষ্কার　　ঘ. মানুষের মর্যাদাবোধের অভাব।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। শৃঙ্খলাবোধ কীভাবে মানুষকে উন্নত জীবন দান করতে পারে ব্যাখ্যা করুন।

২। প্রমাণ করুন 'সময়ানুবর্তিতা ও নিয়মানুবর্তিতা শৃঙ্খলাবোধের নামান্তর'।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৯ : ১. গ ২. খ

পাঠ-৩.১০ সততা, নিষ্ঠা ও পেশাগত নৈতিকতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সততা ও নিষ্ঠা কী তা বলতে পারবেন।
- পেশাক্ষেত্রে সততা ও নিষ্ঠার ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পেশাক্ষেত্রে নৈতিকতার অবস্থান বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মানুষ শান্তিপ্রিয়। কোন রকম ঝামেলা ছাড়া দিন কাটানো মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। তাই সৎ পথে নিয়মনীতি মেনে চলতে পারলে সে খুশি হয়। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে নানা রকম বাধাবিঘ্ন, বিভিন্ন রকম সমস্যা মানুষকে সহজ ও সরল পথে চলতে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। সে কারণে মানুষ জীবনের পথকে মসৃন করে তুলতে নানা রকম কৌশল অবলম্বন করে। অভিজ্ঞতা তাকে জানিয়ে দেয় যে অন্যায় বা অসৎ পথ মানুষের জীবনকে দূর্বিষহ করে তোলে, লোভ ও হিংসা মানুষকে দিকবিদিক তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়, তার জীবনকে অস্থির করে তোলে। একটি মিথ্যে কথা বললে তার পিছনে বহু মিথ্যে কথা বলার প্রয়োজন এসে জড় হয়। এসব কারণে সুন্দর ও স্বচ্ছ পরিবেশে মানুষ সত্য কথা বলে, সহজ পথে চলে এবং সৎ ও ন্যায়ের পথে নিজের কাজটি করে। এ জন্যে প্রয়োজন পরিবেশ ও পরিস্থিতি সহজ ও স্বাভাবিক রাখা। এমন পরিবেশ তৈরি করতে হবে যেন মানুষ সেখানে পরম নিষ্ঠা নিয়ে কাজ করতে পারে, এমন আইন তৈরি করতে হবে যেন তা সকল মানুষের মর্যাদা সমানভাবে রক্ষা করতে পারে। তবেই মানুষ আইনকে শ্রদ্ধা করবে, সৎ পথে নিয়ম মেনে মনোযোগ দিয়ে নিজের কাজটি করবে এবং মানুষ মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় পূর্ণ জীবন লাভ করবে।

কাজ - এক

নিচের এ কাজটি বিভিন্ন ধরনের প্রতিকুল পরিবেশে আপনাকে মাথা ঠাণ্ডা রেখে সততার সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করার পথনির্দেশ দেবে। আপনি নৈতিকতা সম্পন্ন একজন মানুষ হয়ে নিজেকে যাচাই করার সুযোগ লাভ করবেন।

সমস্যা ১ ঃ ধরুন, ক্লাসে দুষ্টুমি করেছে বলে আপনার সন্তানকে স্কুলের একজন শিক্ষক নির্দয়ভাবে মেরেছেন। বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষকরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে যান এবং সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়ার পর শিক্ষকরা তাকে বাড়ি পৌঁছে দেন। এ অবস্থায় আপনি কী করবেন?

সমস্যা ২ ঃ ধরা যাক, আপনার একজন আত্মীয় আপনার সই নকল করে ফিক্সড ডিপোজিট থেকে আপনার জমানো একটি বড় অংকের টাকা তুলে নিয়েছে। সে সম্পূর্ণ ব্যাপারটি অস্বীকার করছে। এ অবস্থায় আপনার কর্তব্য কি?

সমস্যা ৩ ঃ মনে করুন আপনার একজন প্রতিবেশী তার বাড়ির চতুর্দিকে দেয়াল দেয়ার জন্য আপনাকে না জানিয়েই আপনার জমির উপর একটি ফলবান আমগাছের অনেকগুলো ডাল কেটে গাছটির বিশেষ ক্ষতি করেছে। উল্লেখ্য যে, ডালগুলো প্রতিবেশীর জমির উপর পড়েছিল। এমন একটি অবস্থায় আপনার কী করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?

সমস্যা ৪ ঃ আপনার বাড়িতে নানাবিধ ঝামেলা, পথের দূরত্ব, সময় মত রিক্‌সা বা গাড়ি না পাওয়া ও ট্রাফিক জ্যাম ইত্যাদি কারণে ইদানিং আপনার অফিসে যেতে ৩০ মিনিট থেকে ৪৫মিনিট দেরী হয়ে যাচ্ছে। আপনার কর্মস্থানের বড়কর্তা এজন্য একদিন আপনাকে ডেকে কৈফিয়ত তলব করলেন। আপনি তাকে কী বলবেন এবং কী করবেন?

সততা

চাকরি ক্ষেত্রে সততা কী? অফিসে বা ব্যাবসায়ী প্রতিষ্ঠানে সব সময় সত্যি কথা বলা, কোন অন্যায় কাজ না করা এবং সত্য ও ন্যায়ের পথকে অনুসরণ করাকে চাকরি ক্ষেত্রে সততা বলে।

চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে সততা

চাকরির জন্যে যখন সাক্ষাৎকার দেবেন বা পরীক্ষায় বসবেন তখন সবার আগে সততার কথাটি মনে রাখবেন। চাকরি দেয়ার আগে প্রার্থীর পূর্ব ইতিহাস ও বর্তমান যোগাযোগ অবস্থা যাচাই করে নেয়া হয়। এ সময়ই তার সততা ও নৈতিক অবস্থান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। প্রার্থীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার জন্য তার ব্যক্তিত্বের পরীক্ষা এবং সামাজিক সম্পর্ক কতটা গভীর সে সম্বন্ধেও পরীক্ষা নেয়া হয়। সতর্ক থাকবেন! সাক্ষাৎকার বোর্ডে, পরীক্ষায় বা আপনার বায়োডাটায় কোন ভুল বা মিথ্যা তথ্য দেবেন না! দিলে অথবা আপনার যে ছবি দিয়েছেন তা অস্পষ্ট বা সন্দেহজনক হলে আপনার আজকের চাকরির দরখাস্ত তো বটেই, আগামী দিনের জন্যেও যে কোন জায়গায় চাকরির দরখাস্ত করা বাতিল হয়ে যাবে। সরকারী ও বেসরকারী সব জায়গায় আপনি একজন মিথ্যেবাদী ও প্রতারক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যাবেন।

আন্তঃব্যক্তিক সদাচরণ

চাকরি ক্ষেত্রে শুধু জ্ঞান ও দক্ষতা থাকলেই সফলতা লাভ করা যায় না। এর জন্য আপনি আপনার বড়কর্তার সাথে এবং সহকর্মীদের সাথে কেমন সম্পর্ক রেখেছেন, অর্থাৎ তারা আপনার সম্পর্কে কী বলেন তার উপর অনেকাংশে নির্ভর করতে হয়। চাকরিক্ষেত্রে বড়কর্তা বা সহকর্মীদের কাছে আপনার কোন সহকর্মীর বিরুদ্ধে মিথ্যা নালিশ করে নিজের দাম বাড়াবেন না। এতে শুধু মিথ্যাবাদী হিসেবেই নয় নিন্দুক হিসেবেও আপনার দুর্নাম প্রতিষ্ঠিত হবে। নির্ধারিত কোন কাজ সম্পন্ন করার প্রতিজ্ঞা করলে বা কোন সহকর্মীকে তার কাজে সাহায্য করার জন্য প্রতিজ্ঞা করলে তা রাখার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন। অন্যথায় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী হিসেবে আপনার দুর্নাম ছড়িয়ে পড়বে।

তুচ্ছ বা ছোটখাট চুরি

অফিস থেকে কাগজ-কলম বা এ জাতীয় কোন জিনিস বাড়ি নিয়ে যাবেন না। কারণ যেহেতু এগুলো আপনার ব্যক্তিগত সম্পত্তি না, এটি চুরি হিসেবে ধরা হবে। যারা নিয়মিত দেরী করে আসেন বা অফিসে প্রায়ই অনুপস্থিত থাকেন, তাদেরও এক ধরনের চোর হিসেবে অনেকে গণ্য করে থাকেন। একে বলা হয় সময় চুরি। কারণ অফিসে আপনার কাজের প্রতি মুহূর্তের জন্য আপনাকে বেতন দেয়া হয়। এরজন্য ধীরে ধীরে লোকে আপনাকে ঘৃণা করতে শুরু করে। ঘুষ দেয়া ও নেয়া, বাজে জিনিস দিয়ে খদ্দেরকে ঠকানো, অফিসের সম্পদ চুরি করে বিক্রী করে দেয়া ইত্যাদি অপরাধ আপনার বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করার উপযোগী। আপনার বিরুদ্ধে দুষ্কৃতিকারীর চার্জ আনা হতে পারে। তবে এসব ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ সাধারণত নিজেদের প্রতিষ্ঠানের দুর্নাম হওয়ার ভয়ে আদালত পর্যন্ত না যেয়ে দোষী ব্যক্তিকে তার চাকরি থেকে অব্যহতি দেয়ার ব্যবস্থা নেন।

নৈতিকতার বিরোধিতা করা

যে কোন প্রতিষ্ঠানে কার্য পরিচালনার জন্য শক্তিশালী নৈতিক নিয়ম-শৃঙ্খলা বলবৎ থাকে। অনেক কর্মকর্তা বা কর্মচারী অনেক সময় দাপ্তরিক কাজের কোন গোপন তথ্য টাকার বিনিময়ে বা অন্য কোনভাবে বাইরে প্রকাশ করে দেয়। এটি একটি ভয়ংকর অপরাধ। এইসব গোপন তথ্য বা 'কপি রাইট' বাইরে বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের কাছে প্রকাশ না করে দেয়ার জন্য প্রতিষ্ঠান সাধারণত বন্ড সই করিয়ে নেয়। এরপরও যারা এসব তথ্য প্রকাশ করে কর্তৃপক্ষ তাদের কাজ থেকে অব্যহতি দেয়ার ব্যবস্থা করেন। অন্যদিকে এ ধরনের ব্যক্তি অন্য কোথাও চাকরি পান না, কারণ তার সম্পর্কে গোপন তথ্য প্রকাশজনিত খবরটি সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে।

নিষ্ঠা কী?

নিষ্ঠা এমন একটি গুণ যা চাকরিক্ষেত্রে আপনার সুনাম বৃদ্ধি করবে এবং কাজ করে আপনি আত্মতৃপ্তি লাভ করবেন। কর্তৃপক্ষ সব সময়ই কর্মচারী বা কর্মকর্তার কাজের প্রতি নিষ্ঠা আশা করে। নিষ্ঠা হল কাজের প্রতি ব্যক্তির অখণ্ড মনোযোগ ও দায়িত্বের প্রতি একনিষ্ঠ কর্তব্যপরায়ণতা। নিষ্ঠা আপনার মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত করবে ও নিজের প্রতি আপনাকে মর্যাদাশীল করে তুলবে। মানুষ যখন তার কোন কাজের ফলাফল নিয়ে অনেক বড় আশা করে তখন কাজের প্রতি সে নিষ্ঠাবান হয়। অর্থাৎ কাজে মনোযোগী হয়, কঠিন পরিশ্রম করে এবং সমগ্র কাজটি যথেষ্ট দায়িত্ব নিয়ে সম্পন্ন করে।

কাজের প্রতি নিষ্ঠা প্রদর্শন

আগের দিনে মানুষ তার কাজের প্রতি এত নিষ্ঠাবান থাকত যে এক চাকরিতে সে দীর্ঘ ২৫ বছর কাটিয়ে দিত। নিজেকে তারা কাজের গোলাম বলে মনে করত। আধুনিক কালে মানুষ ২/৩ বছরও এক চাকরি নিয়ে কাটায় না। কোন একটি চাকরির কাজের প্রতি মনোনিবেশ করে না। এক চাকরি থেকে অন্য চাকরিতে ছুটে বেড়ায় কিন্তু কোথাও শান্তি পায় না।

মানুষ যখন তার চাকরিতে কাজের বিষয় সম্পর্কে অধিক জানতে চায় তখন সেই কাজে তার নিষ্ঠা প্রকাশ পায়। কোন একটি কাজে তিনি স্থির থাকেন, দীর্ঘদিন কাজ করতে করতে তিনি কাজের গভীরে প্রবেশ করেন, কাজের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তিনি জ্ঞানলাভ করেন, তখন তিনি কাজ করে আনন্দ পান এবং আত্মতৃপ্তি লাভ করেন। ফলে তার নিজের যেমন উন্নতি হয়, প্রতিষ্ঠানেরও উন্নতি হয়।

কাজের ক্ষেত্রে কোন জটিল সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে মানুষ তার নিষ্ঠা প্রয়োগ করে। একজন নিষ্ঠাবান পেশাধারী যদি কোন কর্তৃত্ব তার নাও থাকে সমস্যা দেখলেই তিনি এগিয়ে আসেন এবং সমাধানের জন্য চেষ্টা করেন। অন্যদিকে কাজের প্রতি যার কোন আগ্রহ নেই, প্রতিষ্ঠান ধ্বংসের মুখে আসলেও তার ভিতরে কোন বোধ কাজ করে না। তিনি নিস্পৃহ থাকেন। যেমন, বিদ্যালয়ে কোন শিক্ষক যদি দেখেন শ্রেণিকক্ষগুলো ঠিকমত ঝাড়ু দেয়া হয় না, নোংরা, ময়লা সারা ক্লাসে ছড়িয়ে থাকে এবং এতে শিক্ষার্থীদের পরিবেশগত ও স্বাস্থ্যগত সমস্যা দেখা দেয়। নিষ্ঠাবান শিক্ষক তখন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য উদ্যোগ নেন। কিছু না পারলেও নিজে এবং শিক্ষার্থীদের সাহায্য নিয়ে শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার করেন।

অনেক নিষ্ঠাবান ব্যক্তি অনেক ক্ষেত্রে হাতের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার কাজ ছেড়ে তিনি নড়েন না। এমন কি রাত হয়ে গেলেও দেখা যায় তিনি কাজ করেই চলেছেন। এ ধরনের মানুষের কাছে সময় অনেক মূল্যবান। প্রত্যেক পেশাধারীর জন্য সময় নির্দিষ্ট। নিষ্ঠাবান ব্যক্তি কাজের মধ্য দিয়ে এমন কি নিজস্ব সময়ও ব্যয় করার জন্য তিনি নিজের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকেন। কারণ তার কাছে কাজটি শেষ করা অনেক বেশি জরুরী। এরকম নিষ্ঠাবান ব্যক্তি সাধারণত সবার আগে অফিসে আসেন এবং সবার পরে অফিস থেকে বের হন।

নিষ্ঠাবান ব্যক্তিরা কখনও কাজের চাপ নিয়ে অভিযোগ করেন না বা কাজের সমস্যা নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভেঙ্গে পড়েন না। অনেকে আছেন সমস্যা দেখলেই পিছিয়ে যান। কিন্তু নিষ্ঠাবান ব্যক্তি আনন্দ নিয়ে কাজ করেন।

সমস্যায় পড়লে তারা বলেন 'আরে সমস্যা তো থাকবেই, ঘাবড়ালে চলবে কেন? আসুন না দেখা যাক কী করা যায়।'

কাজে নিষ্ঠাবান হওয়ার জন্য একজন ব্যক্তিকে নানা ধরনের গুণাগুণ প্রয়োগ করতে হয়, যেমন, শৃঙ্খলা, মনোযোগ, সততা, ধৈর্য্য, কঠোর পরিশ্রম ইত্যাদি আরও অনেক কিছু। এসব গুণ প্রয়োগ করে ব্যক্তি কাজটিকে সুষ্ঠু উপায়ে সম্পন্ন করেন। এ

কারণে তিনি নিজে আনন্দে থাকেন, সব বিষয়ে তার ইতিবাচক মনোভাব থাকে এবং সময়ের সদ্ব্যবহার করেন বলে যথেষ্ট অবসর সময় ভোগ করতে পারেন।

পেশাগত নৈতিকতা

পেশাক্ষেত্রে নৈতিকতা পেশাধারী ব্যক্তির চারিত্রিক গুণাবলি ও মূল্যবোধের অর্থ প্রকাশ করে। আমরা ইউনিট ছয় থেকে এ পর্যন্ত ব্যক্তির যে সব গুণাগুণ নিয়ে আলোচনা করেছি, তার সবকিছুই নৈতিকতার অন্তর্ভুক্ত। যেমন, সততা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, গোপনীয়তা রক্ষা করা, নিরপেক্ষতা, আইনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও বাধ্যতা, যথাযথ সম্মান দেখানো, বিশ্বস্ততা, নিষ্ঠা ইত্যাদি। একজন পেশাধারী ব্যক্তির জন্য পেশাগত কাজের সাথে সাথে এসব গুণ ধারণ করা ও প্রতিক্ষেত্রে তার প্রয়োগ করা তার পেশাদারিত্বেরই অংশ বলে মনে করা হয়।

কর্মক্ষেত্র বা কর্মপ্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নতির জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ পেশাগত নৈতিকতা অনুসরণ করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে দেখা যায়, প্রায় সব প্রতিষ্ঠানই তার নিজস্ব নিয়ম-শৃঙ্খলা সমন্বিত বিধি বা আইনের ধারা প্রচলন করেন। যা অন্তর্ভুক্ত ও সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি মেনে চলতে বাধ্য হন। এসব বিধি বা আইন ব্যক্তির নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সমন্বিত হয়ে থাকে। এর ফলে প্রতিষ্ঠানের কাজ একদিকে যেমন নির্দিষ্ট নিয়মে সুশৃঙ্খলভাবে এগিয়ে চলে। অন্যদিকে সকল পেশাধারী ব্যক্তি সুনির্দিষ্ট গতিতে তাদের পেশাজীবন নির্বাহ করতে সক্ষম হন। এখানে সকলের প্রতি সমান দৃষ্টি দেয়া হয় বলে সকলে সন্তুষ্ট থাকেন।

মানুষ নিয়মের অনুগত। তাই সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করে চলতে সে ভালবাসে। পেশাগত নৈতিকতাকে যদি প্রতিদিনের নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করে তোলা যায় তবে সে স্বত:স্ফুর্তভাবে তা মেনে চলতে নিজের থেকে তাগিদ অনুভব করবে। সারা জীবন ধরে পেশাগত নিয়ম ও নৈতিকতা অনুসরণ করে মানুষ নিজের চরিত্রের দৃঢ়তা প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। ফলে সে একাধারে প্রতিষ্ঠানের ও সমাজের জন্য মূল্যবান সম্পদ হয়ে ওঠে।

কাজ - দুই

আপনার প্রতিদিনের কাজের কোন কোন ক্ষেত্রে আপনি সততা রক্ষা করতে পারেন এবং নিষ্ঠাবান হতে পারেন তা পৃথকভাবে চিহ্নিত করুন। এজন্য প্রথমে কমপক্ষে দশটি কাজের কথা লিখুন। এবার প্রতিটি কাজের জন্য কীভাবে সততা রক্ষা করা যায় এবং কাজটি সম্পন্ন করতে কীভাবে আপনার নিষ্ঠা প্রয়োগ করা যায় তা কাজের পাশে লিখুন।

সারসংক্ষেপ

সততা ও নিষ্ঠা এ দুটিই মানুষের নৈতিক চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত গুণাবলি। একজন পেশাজীবী নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার পাশাপাশি যদি সামাজিক স্বীকৃতি ও মূল্যায়ন আশা করেন তবে তাকে উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। তার চারিত্রিক দৃঢ়তা তাকে মানুষের কাছে মর্যাদাশীল হিসেবে পরিচিত করবে। অন্যদিকে তাকে নিয়ে প্রতিষ্ঠান গর্ব করবে কারণ তার নিষ্ঠায় ও সততায় প্রতিষ্ঠানের লাভজনক আয় হয়েছে এবং প্রতিষ্ঠান উপকৃত হয়েছে। এভাবে দেখা যায় উন্নত নৈতিক চরিত্র মানুষকে

- কর্মক্ষম করে তোলে
- মর্যাদা দেয়
- স্বীকৃতি দেয়
- অর্থ ও বিত্ত দেয়
- সুখ ও শান্তি দেয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। শুধু জ্ঞান ও দক্ষতা থাকলেই চাকরিতে উন্নতি করা যায় না, এর সাথে আরও কী দরকার হয়?
ক. কর্মক্ষমতা
খ. শান্তিপ্রিয়তা
গ. নৈতিকতা
ঘ. উচ্চতর যোগ্যতা।

২। কোন ধরনের পেশাজীবীকে নিষ্ঠাবান বলা যায়?
ক. মনোযোগ ও ধৈর্য নিয়ে যারা কাজ করেন
খ. যারা রাত জেগে কাজ করেন
গ. অন্যের সাহায্য ছাড়াই যারা কাজ করেন
ঘ. যারা সততার সাথে কাজ করেন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। 'সৎ ও নিষ্ঠাবান হওয়া সম্পূর্ণ নিজের উপর নির্ভর করে' - আপনার মতামত দিন।
২। ব্যক্তির নৈতিকতা তার পেশাক্ষেত্রে কীভাবে তাকে প্রতিষ্ঠিত করে ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১০ : ১. গ ২. ঘ

পাঠ-৩.১১ ক্যারিয়ার গঠনে প্রযুক্তির গুরুত্ব ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা গঠনের উপায়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- প্রযুক্তি কী তা বলতে পারবেন।
- ক্যারিয়ার গঠনে প্রযুক্তির ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রযুক্তিগত দক্ষতা গঠনের উপায় আলোচনা করতে পারবেন।

সৃষ্টির শুরু থেকেই মানুষ বুদ্ধিমান প্রাণী হিসেবে জগতের কাছে পরিচিত হয়। কিন্তু মানুষ তখন ছিল সহায় স্বম্বলহীন, কোন জ্ঞান ছিল না। ধীরে ধীরে প্রয়োজনের তাগিদে বুদ্ধির প্রয়োগ করে সে জানার চেষ্টা করে এবং স্বাবলম্বী হওয়ার প্রচেষ্টা চালায়। দৈনন্দিন জীবনে নানা ধরনের প্রতিকুলতার মোকাবেলা করে চলতে চলতে জ্ঞানের বিচিত্র পথে সে এগিয়ে চলে। যেমন, আত্মরক্ষা কী করে করতে হয়, কোথায় ও কীভাবে খাদ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে, প্রাকৃতিক প্রতিকুল পরিবেশ থেকে রক্ষা পেতে কী করতে হবে ইত্যাদি সম্মন্ধে সে নিজের চেষ্টাতেই জ্ঞান অর্জন করেছে। বেঁচে থাকার জন্য নানারকম হাতিয়ার ও উপাদান বা সাহায্যকারী যন্ত্র নির্মাণ করেছে। এভাবে একদিকে সে যেমন আত্মরক্ষার জন্য সুসংবদ্ধ দল বা সমাজ গঠন করেছে, অন্যদিকে জীবন যাত্রা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান নির্মাণে সচেষ্ট হয়েছে। মানব জীবনে প্রযুক্তির বিকাশ এখান থেকেই শুরু হয়েছে। সেইথেকে মানুষ তার প্রয়োজনীয় উপাদান, ঘরবাড়ি, পোশাক, বস্তুসামগ্রী সবকিছুতে প্রলেপ লাগিয়ে নতুন নতুন উদ্ভাবন করে সেগুলোকে আধুনিক থেকে আধুনিকতর করেছে এবং ক্রমে জীবনযাত্রা প্রণালী সহজ করে তুলেছে।

কাজ - এক

নিচের এ কাজটি করলে আপনি প্রতি দিন আমরা কতবার প্রযুক্তি নির্ভর কাজ করি এবং দৈনন্দিন জীবনে কতভাবে প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল তা অনুধাবন করতে পারবেন।

ফারিয়া মাধ্যমিক স্কুলে গণিত বিষয়ের একজন শিক্ষক। শুক্রবার ছাড়া সপ্তাহের ছয়দিনই তাকে ৭:১৫টার মধ্যে স্কুলে পৌঁছতে হয়। তার স্কুল বাড়ির কাছেই। হেঁটে যেতে খুব বেশি হলে ১৫ মিনিট সময় লাগে। সেদিন ছিল সোমবার। ঘড়ির ক্রিং ক্রিং শব্দে ফারিয়ার ঘুম ভাঙল। চোখটা একটু ডলে নিয়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল ৬:০০টা বেজে গেছে। গতকাল রাত ২:০০টা পর্যন্ত জেগে কম্পিউটারে কাজ করেছে, সে জন্য আজ উঠতে দেরী হয়ে গেল। খুব চটপট বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল সে। মুখ হাত ধুয়ে নিয়েই রান্না ঘরের দিকে পা বাড়াল। গ্যাসচুলোটা জ্বালিয়ে দিল। কাল রাতে রুটি তরকারী করাই আছে। এখন শুধু রুটিগুলো গরম তাওয়ায় সেঁকে নিয়ে তরকারীটা মাইক্রোওভেনে গরম করে নিল। ৬:৩০টার মধ্যে নাসতা করা শেষ হলে ফারিয়া গোসল করবে বলে বাথরুমে ঢুকে পড়ল। ঘুম থেকে উঠেই সে গিইজার চালিয়ে দিয়েছিল তাই এখন গরম পানি পেল। বাথরুম থেকে বেরুতেই ফারিয়ার মোবাইল ফোনটি বেজে উঠলো। ফোনে কিছু কথা সেরে নিয়ে খুব দ্রুত বাইরে যাওয়ার পোশাক পরে ফারিয়া তৈরি হয়ে গেল।

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন:

১। গল্পটির সমগ্র অংশে ফারিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে প্রযুক্তি ব্যবহার করেছে?
২। প্রযুক্তির ব্যবহার তাকে কী ধরনের সুবিধা দিয়েছে?
৩। আপনার দৈনন্দিন জীবনে কোন কোন ক্ষেত্রে আপনি প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল লিখুন।

প্রযুক্তি কী?

প্রযুক্তি হল জ্ঞানার্জনের মাধ্যম। বিজ্ঞানের জ্ঞানকে ব্যবহার করে মানুষ নতুন নতুন যে পথ ও দ্রব্য-সামগ্রী উদ্ভাবন করে তাকেই প্রযুক্তি বলা যায়। দৈনন্দিন জীবনকে সহজ পথে পরিচালিত করার জন্য মানুষ নিত্যনতুন প্রযুক্তি সৃষ্টি করে। এর ফলে সে একদিকে যেমন অর্জিত জ্ঞানের ব্যবহার করে অন্যদিকে নতুন দ্রব্য আবিষ্কার করতে গিয়ে নতুন জ্ঞান অর্জন

করে। অন্যকথায় আমরা বলতে পারি প্রযুক্তি হল মানুষের জ্ঞান। এই জ্ঞান প্রয়োগ করে সে নতুন নতুন কর্মপন্থা, আধুনিক যন্ত্র ও বস্তুসামগ্রী তৈরি করে। **প্রযুক্তি** শব্দটি অনেক ব্যপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। মানুষ তার নিজ জীবনপদ্ধতি ও বোধগম্যতার ভিত্তিতে প্রযুক্তি শব্দের ব্যাখ্যা করে।

যেমন, আমরা প্রায়ই বলে থাকি 'জীবন পথে চলতে প্রযুক্তি ব্যবহার করা প্রয়োজন'। এর অর্থ কী? মানুষ যে শুধু নিত্যনতুন আবিষ্কৃত বস্তু ব্যবহার করে তার জীবন পথ চলছে তা নয়, পথ চলতে প্রতিনিয়ত সে যেসব পদ্ধতি অনুসরণ করছে, নতুন নতুন সংগঠন তৈরি করছে এবং তার সাহায্য নিচ্ছে এ সবই প্রযুক্তিগত ধারণার অন্তর্ভুক্ত।

আমরা প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করি এবং প্রযুক্তি ব্যবহার করি বলেই সহজ ও স্বাচ্ছন্দ জীবনের আনন্দ উপভোগ করি। সাধারণভাবে আমরা যখন কোন সমস্যায় পড়ি তখন আমাদের জ্ঞানের প্রয়োগ করে নতুন কোন পথ বাতলাই, বা নতুন কিছু আবিষ্কার করি যা আমাদের সেই সমস্যার সমাধান করে দেয়। এ বিষয়টি আপনার জানা প্রয়োজন যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি একই বিষয় নয়। বিজ্ঞান হল জ্ঞান বা বিদ্যার একটি শাখা, অন্যটি হল তার প্রয়োগ বা সৃষ্টি যা সমস্যার সমাধান করে বা কোন কাজ সম্পন্ন করে। জীবনের বিচিত্র ক্ষেত্রে নানা ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়। যেমন, একটি কলম। লেখার কাজে আমরা তা ব্যবহার করি। বিজ্ঞানের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে কলম আবিষ্কৃত হয়েছে। কলম একটি বস্তু। একে হার্ডওয়্যার বলে এবং কলম উৎপাদন প্রণালীকে সফ্টওয়্যার বলে। আবার একটি বাড়ি বা কোন যন্ত্র নির্মাণ করতে শুরুতে যে নক্শা বা ডিজাইন আঁকা হয় এবং যে পরিকল্পনা করা হয় তাকে সফ্টওয়্যার বলে। অন্যদিকে বাড়ি বা যন্ত্র নির্মাণ করতে যে উপাদান ব্যবহার করা হয় যেমন, ইট, কাঠ, লোহা, সিমেন্ট ইত্যাদিকে হার্ডওয়্যার বলে।

প্রযুক্তিকে যদি মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করা যায় তবে তা সার্থক হয়। কিন্তু প্রযুক্তি যখন কোন ধ্বংসাত্মক কাজ বা মানুষের অকল্যাণে ব্যবহৃত হয় তখন বিজ্ঞানের জ্ঞান ব্যর্থ হয়ে যায়। সে কারণে প্রযুক্তি শুধু ব্যবহার করলেই হবে না তার ব্যবহারকে কল্যাণমুখী করে তোলার ব্যাপারে আমাদের ভাবতে হবে।

ক্যারিয়ার গঠনে প্রযুক্তির গুরুত্ব

ইউনিট এক এ আপনারা ক্যারিয়ার সম্বন্ধে পর্যাপ্ত ধারণা লাভ করেছেন। আপনারা জেনেছেন যে কাজ, পেশা, বৃত্তি ও চাকরি ইত্যাদির সমন্বিত বা সাধারণ অবস্থাকে ক্যারিয়ার বলা হয়। অর্থাৎ মানুষ যে কাজই করুক না কেন দীর্ঘ সময় পর কেবল সে কাজে ক্যারিয়ার গঠন করতে পারে। ক্যারিয়ার গঠন করার জন্য তাকে ধাপে ধাপে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অর্জন করে এগিয়ে যেতে হয়। এ জন্য প্রয়োজন হয় সুনির্দিষ্ট শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণকালে সে প্রযুক্তির ব্যবহার করে শিক্ষা গ্রহণ প্রক্রিয়াকে অনেক বেশি সহজ ও আধুনিক করে তুলতে পারে। আধুনিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণে প্রযুক্তির ব্যবহার অনস্বীকার্য।

সমাজ বিকাশের সাথে সাথে সমাজভুক্ত সদস্য অর্থাৎ মানুষও ক্রমে বিকশিত হতে থাকে এবং তাদের প্রয়োজন ও যোগ্যতার সীমাও দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। আগে মানুষ সামান্য কিছু লেখাপড়া করেই, বড়জোর কলেজ পর্যন্ত পড়ে এবং পাশ করে কোন একটা কাজ বা চাকরিতে ঢুকে পড়ত। সেখানে তার বিশেষ কোন দক্ষতা চাওয়া হত না। মানুষ কাজ করতে করতে দক্ষতা অর্জন করত এবং তাই দিয়েই চাকরি ও পেশাক্ষেত্রে সফলতার সাথে কাজ সম্পন্ন করতে সচেষ্ট থাকত। কিন্তু যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে বিজ্ঞানের জ্ঞান মানুষকে অনেক সহজ ও যান্ত্রিক জীবনের ইঙ্গিত দিয়েছে। মানুষ সেগুলো ব্যবহার করার জন্য প্রতিনিয়ত জ্ঞান অনুসন্ধানে দিক্‌বিদিক ছুটে চলেছে। মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাস্কৃতিক ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। সে কারণে তার চাহিদাও বেড়েছে। এখন সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োজন হয়। চাকরির নিম্ন স্তরেও নির্দিষ্ট যোগ্যতা চাওয়া হয়। ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখা যেমন বেড়েছে, বেড়েছে বিদ্যালয়ের সংখ্যা, বিচিত্র ধরনের সব শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়েছে এবং সেই সাথে শিক্ষার সুযোগও বৃদ্ধি পেয়েছে।

ব্যবসায় ক্ষেত্রে ক্যারিয়ার গঠন: ইদানিংকালে বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বাজারে নিজেদের যোগ্য প্রতিযোগী হিসেবে দাঁড় করানোর জন্য নতুন নতুন প্রযুক্তিগত দ্রব্য উৎপাদন করছে, সেগুলো বাজারে ছাড়ছে এবং মানুষের জন্য সেবামূলক উদ্যোগ নিচ্ছে। যেমন, একেবারে আধুনিক উৎপাদন মোবাইল ফোনের কথাই বলা যাক। এই দ্রব্যটি প্রতি মহূর্তে নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করছে এবং মোবাইল ফোনের বিভিন্ন সংস্থা যেমন Apple, Samsung ইত্যাদি বাজারে তাদের

প্রতিযোগিতা টিকিয়ে রাখতে নতুনভাবে উদ্ভাবিত স্মার্ট ফোন বাজারে ছাড়ছে। আধুনিক অগ্রগামী প্রযুক্তি ব্যবহার করে তারা প্রতিযোগিতার ধারা শুধু বজায় রাখছে না, সেখানে জয়লাভ করছে।

অগ্রগামী প্রযুক্তি: প্রযুক্তি গতিময়। লক্ষ করবেন প্রযুক্তিগত উৎপাদিত দ্রব্য সব সময়ই পরিবর্তিত হতে থাকে এবং সে পরিবর্তনের সাথে সাথে আমাদের চাহিদারও পরিবর্তন ঘটে। কোন একটি দ্রব্য বাজারে নতুন কী প্রকার এল এবং তা আমাদের নতুন কী সেবা দিতে পারছে, আমরা প্রতিনিয়ত তার খোঁজখবর করি। আমরা নতুন এসব দ্রব্য ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করি।

ক্যারিয়ার গঠনে যোগাযোগ প্রযুক্তি: তথ্য যখন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বা এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে প্রযুক্তির মাধ্যমে পরিবাহিত হয় তখন আমরা সেই প্রক্রিয়াকে তথ্য প্রযুক্তি বলি। বিভিন্ন কারণে তথ্যের আদান প্রদান ঘটে। যেমন, মানুষ তার মনের কথা বা কাজের কথা অন্যকে জানাতে, মনের আবেগ অন্যের কাছে প্রকাশ করতে, কোন ধারণা বা তথ্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পাঠাতে প্রযুক্তিগত মাধ্যম ব্যবহার করে। এখন এসব কাজে মানুষ ফোন, কম্পিউটার, ই-মেইল, ফ্যাক্স ইত্যাদি ব্যবহার করে। ক্যারিয়ার গঠনের জন্য কোন প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পাঠাতে হয়, সিদ্ধান্ত জানাতে হয়, প্রতিষ্ঠানটি যাদের সেবা করে তাদের প্রয়োজন মেটাতে হয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানুষ তার ক্যারিয়ার এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

শিক্ষা প্রযুক্তি ও ক্যারিয়ার: শিক্ষা প্রযুক্তি শিক্ষার্থীর উচ্চ পর্যায়ের বোধগম্যতা ও জ্ঞান অর্জনের একটি ক্ষেত্র। শিক্ষাক্ষেত্রে কোন গবেষণার সমাধান কীভাবে করা যায়, শিক্ষা পরিকল্পনা কীভাবে করতে হয়, কীভাবে মূল্যায়ন করতে হয় বা শিক্ষা প্রয়োগ করতে হয় ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষা প্রযুক্তি নির্দেশনা দেয়। শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের শিখনে উদ্বুদ্ধ করেন, সহজ ও সঠিক উপায়ে শিখন সামগ্রীর ব্যবহার নিশ্চিত করেন, কোন নতুন বিষয়ের সাথে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দিতে সঠিক কৌশল ব্যবহার করেন। শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ একাজে যখন সফল হন তখন তাদের ক্যারিয়ার গড়ে ওঠে।

ক্যারিয়ার গঠনে গঠনমূলক প্রযুক্তি: কোন ইনজিনিয়ারিং গাঠনিক উপাদানকে দুভাবে ভাগ করা যায়। এক হল ঘরবাড়ি গঠন এবং অন্যটি হল কোন বস্তু গঠন। যেমন, একটি মোবাইল ফোন তৈরি করা বা জানালা-দরজা, কোন যন্ত্র, ভারী কোন দ্রব্য ইত্যাদি তৈরি করা। চিন্তা করে দেখুন কত প্রযুক্তি প্রয়োগের সমন্বয়ে একটি দালানকে সোজা করে দাঁড় করানো যায়। একজন প্রকৌশলী তার ক্যারিয়ার গঠনের জন্য দালানের পরিকল্পনা করা থেকে শুরু করে ইট, বালি, সিমেন্ট, রড, রং ইত্যাদি সহযোগে প্রস্তুতকৃত বাড়ি সব ক্ষেত্রেই প্রযুক্তি ব্যবহার করেন। এমনকি এখানে তিনি যে ডিজাইনটি পরিকল্পনা করেছেন সেটিও প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্ত। এভাবে প্রকৌশলী তার ক্যারিয়ার গঠনে প্রতি ক্ষেত্রে প্রযুক্তি ব্যবহার করে চলেছেন।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে ক্যারিয়ার গঠনে প্রযুক্তি: মানুষকে সুস্থ রাখার জন্য এবং তার আয়ু বৃদ্ধি করার জন্য চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। প্রযুক্তি মানুষের ব্যথা কমিয়ে দেয়, মানুষকে তা রোগ থেকে মুক্তি দেয়, তার কোন ক্ষতস্থান সারিয়ে তোলে। আধুনিক যুগে উন্নত বিশ্বে মানুষ রোগ থেকে দূরে থাকার জন্য বিভিন্ন ধরনের ভেষজ দ্রব্য যেমন, মেথি, দারচিনি, রসুন, কালোজিরা ইত্যাদি নিয়মিত সেবন করে। এসব দেশে চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার অনেক বেশি। সে কারণে আমাদের দেশের তুলনায় উন্নত দেশে অকাল মৃত্যুর হার অনেক কম। মানুষের রোগ নির্ণয় করতে, সে রোগের চিকিৎসা করতে এবং মানুষের কল্যাণে সে রোগ সম্বন্ধে গবেষণা করতে চিকিৎসা প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। চিকিৎসাবিদরা প্রতি ক্ষেত্রে প্রযুক্তি ব্যবহার করে একদিকে মানুষকে যেমন দ্রুত রোগমুক্ত করছেন অন্যদিকে চিকিৎসা সেবায় নিজের ক্যারিয়ার গড়ে তুলছেন।

ক্যারিয়ার গঠনে তথ্য প্রযুক্তি: তথ্য প্রযুক্তি এক গুচ্ছ সফ্টওয়্যার ও হার্ডওয়্যারের সমন্বয়ে তথ্য সংরক্ষণের কাজ করে। তথ্য প্রযুক্তি মানুষের কাছে সঠিক সময়ে সঠিক তথ্যটি পৌঁছে দেয়। কোন একটি সংস্থায় অভ্যন্তরীণ কোন সিদ্ধান্ত প্রচারের জন্য বা গ্রাহক সুবিধা দেয়ার জন্য তথ্য সম্প্রচার করা হয়। যেমন, গ্রামীণ ফোন কোম্পানী তার গ্রাহকদের জন্য নানা ধরনের সুবিধা মোবাইল ফোন, বিল বোর্ড বা সংবাদপত্র ইত্যাদির মাধ্যমে তথ্যের সাহায্যে প্রতিনিয়ত প্রচার করছে। তথ্য সংরক্ষণ ও প্রচারের সাথে যারা কাজ করেন তারা সমগ্র ব্যবস্থাটি পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় সঠিক পদ্ধতি প্রয়োগের

মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তির বিকাশসাধন করেন এবং নিজেরা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। এই ভাবে তাদের কর্মকাণ্ড ক্যারিয়ার গঠনে সহায়ক হয়।

প্রযুক্তিগত দক্ষতা গঠনের উপায়

প্রযুক্তিগত দক্ষতা গঠনের জন্য প্রযুক্তিগত বিষয়বস্তু শিখন ও অনুশীলন প্রয়োজন। এই বিষয়বস্তুগুলো সাধারণত কোন নির্দিষ্ট কাজ সম্পর্কিত হয়। যেমন, ব্যাংকিং অথবা ক্ষুদ্র ব্যবসায় ইত্যাদি। এখানে ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে চেক ক্লিয়ারিং এর জন্য স্ক্যানার, চেক ভেরিফিকেশন যন্ত্র বা ক্যাশ কাউন্টিং যন্ত্রের ব্যবহারে এসব সম্বন্ধনীয় দক্ষতা ও যোগ্যতার বিকাশ ঘটে।

প্রযুক্তিগত দক্ষতাসম্পন্ন একজন ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত জীবনে নানারকম সমস্যার মোকাবেলা করতে পারে। সে কৌশলী মনোভাব পোষণ করে, এজন্য যে কোন সমস্যার খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হয় এবং সমাধানের জন্য বাস্তব প্রেক্ষাপটে চিন্তা-ভাবনা করে। এ কারণে কোন কাজে প্রযুক্তিগত দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তির সময় অনেক কম নষ্ট হয়, ফলে তার আয় বৃদ্ধি পায়।

প্রযুক্তিগত দক্ষতা গঠন করার উপায়

- প্রযুক্তিগত বই পড়ুন। যা পড়েছেন তা অন্যের কাছে বিশ্লেষণ করুন। বিশ্লেষণের সময় আপনার ধারণা আরও বেশি স্পষ্ট ও সুগঠিত হবে। যা সম্পর্কে বইটি পড়ছেন সে বিষয়ে হাতে কলমে কাজ করুন। অর্থাৎ অনুশীলন করুন।
- প্রশিক্ষণ গ্রহণ করুন। চাকরি ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট দক্ষতা উন্নয়নের জন্য যদি প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পান তবে অবশ্যই তা নিষ্ঠার সাথে গ্রহণ করুন। এর জন্য বর্তমানে আপনার কি দক্ষতা ও যোগ্যতা আছে তা সঠিকভাবে জানুন। অর্থাৎ আত্মবিশ্লেষণ করুন। আপনার পারদর্শিতার স্তর জানা থাকলে পরবর্তী দক্ষতা গ্রহণ করতে সুবিধা হবে।
- প্রয়োগ করুন। প্রশিক্ষণে যা শিখেছেন তা প্রয়োগের জন্য কাজের পরিবেশ তৈরি করুন। অফিসে বা ঘরে যেখানে সুযোগ পাবেন আপনার অর্জিত দক্ষতা প্রয়োগ করে কাজটি সম্পন্ন করবেন। এর ফলে একদিকে আপনার দক্ষতার প্রয়োগ যোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে অন্যদিকে আপনি আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবেন।
- অন্যকে কাজ শেখান। প্রতিষ্ঠানে যারা নতুন, কাজে তেমন দক্ষ না, এমন ব্যক্তিকে কাজে নির্দেশনা দিন। কীভাবে কাজটি করতে হয় দেখিয়ে দিন। এটি করতে গিয়ে আপনার দক্ষতা আরও বৃদ্ধি পাবে এবং আপনার ভিতরে কোন ভুল-ত্রুটি থাকলে বা সন্দেহ থাকলে তা সংশোধন হয়ে যাবে।
- সাথে একটি কম্পিউটার রাখুন। আপনার নিজের কম্পিউটারটি সাথে রাখুন। যে কাজই করুন না কেন আপনার কম্পিউটারে তার কপি রাখুন। অবসরে বা নিজের সময় যেন কাজের ভুল-ত্রুটি সংশোধন করতে পারেন বা বিকল্প ব্যবস্থা সংযোজন করতে পারেন।
- ওয়েব সাইটে বিচরণ করার অভ্যাস তৈরি করুন। আপনার প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু ইন্টারনেটে পাওয়া যায় কিনা তা খোঁজ করুন। কারণ ইন্টারনেট যে কোন বিষয়ে আপনাকে সাম্প্রতিক ও ব্যাপক তথ্য দেবে। আপনার কাজটিকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করার জন্য এসব তথ্য প্রয়োজন হবে।

কাজ - দুই

আপনার বাড়িতে বা অফিসে যেখানে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সংযোগ আছে, সেখানে কম্পিউটার ব্যবহার করে আপনি ইন্টারনেটে প্রবেশ করুন এবং ‘প্রযুক্তি’ সম্পর্কিত কোন ওয়েব সাইটে ঢুকুন। ‘প্রযুক্তি’ সম্পর্কিত একটি তথ্য ডাউনলোড করুন। তথ্যটি পড়ুন এবং বাংলায় এর সারবস্তু লিখুন।

সারসংক্ষেপ

আধুনিক যুগ প্রযুক্তির যুগ। উন্নত দেশে তো বটেই, আমাদের দেশেও মানুষ এখন বহুক্ষেত্রে কোন কাজ সংরক্ষণ ও ব্যবহারের জন্য কম্পিউটার ব্যবহার করছে। এর ফলে সময় বাঁচে। পর্যাপ্ত সময় হাতে থাকে বলে মানুষ এখন বহুগুণ কাজ করতে পারে, নিজের ক্যারিয়ার এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে এবং অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনে মনোনিবেশ করতে পারে। এজন্য প্রযুক্তিগত দক্ষতা উন্নয়ন প্রত্যেক মানুষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। প্রযুক্তিগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য তার কম্পিউটারকেন্দ্রিক কর্ম প্রেরণা থাকা উচিত। এর উপর নানা ধরনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে আছে। প্রয়োজন উপযোগী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে এবং অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ করে ব্যক্তি তার ক্যারিয়ার উন্নতির শিখরে পৌঁছাতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। চিকিৎসাবিদ তার ক্যারিয়ার গঠনে কোন ক্ষেত্রে প্রযুক্তি ব্যবহার করছেন?

ক. চিকিৎসালয়ে খ. গবেষণা কাজে
গ. হাসপাতালে ঘ. প্রতিটিক্ষেত্রে।

২। শিক্ষক শিক্ষা প্রযুক্তির মাধ্যমে নিচের কোন কাজটি করেন?

ক. শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করেন খ. শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন করেন
গ. প্রশাসনিক কাজ করেন ঘ. বিনোদনমূলক কাজ করেন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। 'প্রযুক্তিগত দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তি বাস্তবসম্মত হয়'- উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন।
২। ক্যারিয়ার গঠনে প্রযুক্তির ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১১ : ১. ঘ ২. খ

পাঠ-৩.১২ ক্যারিয়ার গঠনে গাণিতিক দক্ষতা গঠনের উপায়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- গাণিতিক দক্ষতা কী তা বলতে পারবেন;
- গাণিতিক দক্ষতা উন্নয়নে উদ্যোগ নিতে পারবেন;
- গাণিতিক দক্ষতা উন্নয়ন করতে পারবেন।

সংখ্যা, বিভিন্ন সংখ্যার মধ্যে সম্পর্ক, সংখ্যার সাথে সংখ্যার সংযোগ ও এদের পারস্পারিক ক্রিয়া ইত্যাদি সম্পর্কে বোধগম্যতা ও ধারণা গঠন হল গাণিতিক দক্ষতা ও জ্ঞান। পদার্থের আকৃতি, তাদের গাঠনিক অবস্থা, যৌক্তিক প্রয়োগ, পরিমাপ, শ্রেণিভেদ, রীতিনীতি ইত্যাদিও গাণিতিক জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। কোন বিষয়কে সাধারণীকরণ করতে ও বিমূর্তন বা ভাবমূলক করতে গণিতকে ব্যবহার করা যায়। বহুকাল আগে থেকেই বিভিন্ন বিষয়ের উপর শিক্ষার্থীর নিজস্ব ধারণার সংযোগ রক্ষা করতে, যৌক্তিক ও বিমূর্ত চিন্তা করতে তারা তাদের গাণিতিক দক্ষতা প্রয়োগ করতে পেরেছে। এমনকি তাদের চতুর্দিকের জগৎ সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে, বিষয় বিশ্লেষণ করতে এবং তা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করতে তারা তাদের গাণিতিক দক্ষতা ব্যবহার করেছে। গাণিতিক জ্ঞান, আগ্রহ ও দক্ষতা বিদ্যালয় ও তার পরবর্তী জীবনে শিক্ষার্থীর সার্থকতার মূল চাবিকাঠি। এটিও প্রমাণিত হয়েছে যে, শিক্ষার্থী যদি একাধিক ভাষা শিক্ষালাভ করে তবে তার গাণিতিক দক্ষতা মাতৃভাষার সাথে সাথে অন্যান্য ভাষার বিকাশ লাভেও কার্যকরি হয়। শিক্ষার্থী যদি শিশুকালেই গাণিতিক দক্ষতা অর্জন করতে পারে তবে তা তার পরবর্তী জীবনে বহুমুখী প্রতিভার বিস্ফোরণ ঘটায়।

কাজ - এক

নিচের এ কাজটি করলে আপনি আপনার গাণিতিক দক্ষতা যাচাই করতে পারবেন। দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব প্রেক্ষাপটে নানারকম অবস্থা বা সমস্যার উদ্ভব ঘটে। সেসব পরিস্থিতি ও সমস্যা মোকাবেলা করতে বিভিন্ন ধরনের গুণাগুণ ও দক্ষতার প্রয়োজন হয়। তার মধ্যে সূক্ষ্ম চিন্তা, গভীর মনোনিবেশ, মানসিক স্থিরতা, ধৈর্য, নমনীয়তা, আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা, রসবোধ, বাক্‌পটুতা, পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে সাধারণভাবে গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে করতে মানুষ এসব গুণের অধিকারী হয়।

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

১. আপনার বাড়িতে কোন যান্ত্রিক সমস্যা দেখা দিলে বা বিঘ্ন ঘটলে আপনি কি করেন?
২. আপনার দুই বা ততধিক সহকর্মী বা আত্মিয়ের মধ্যে দ্বন্ধ বা মনোমালিন্য তৈরি হলে আপনি কি করেন?
৩. আপনার চতুর্দিকে নিকটজনের মধ্যে কেউ যদি কোন অন্যায় কাজ করে আপনি কীভাবে তাকে মোকাবেলা করেন?
৪. আপনার পরিবার বা কর্মক্ষেত্রে কেউ যদি কোন কাজে ভুল করে আপনি কি তাকে সাহায্য করেন? কীভাবে?
৫. দুঃখের কোন ঘটনাকে আপনি কীভাবে মোকাবেলা করেন?
৬. আনন্দের ঘটনায় আপনার প্রতিক্রিয়া কেমন হয়?
৭. জীবন নির্বাহ করতে কোন বিষয় বা বস্তু আপনার প্রয়োজন, অথচ তা সংগ্রহ করা আপনার পক্ষে সম্ভব না। এমন পরিস্থিতিতে আপনি কি করেন?
৮. আপনার পাশ্ববর্তী কারও বিপদে আপনার করণীয় কী? কীরূপে তা করেন?
৯. পথ চলতে কোন বিপদের সম্মুখীন হলে কী করবেন?
১০. আপনাকে কেউ তাচ্ছিল্ল দেখালে আপনার প্রতিক্রিয়া কেমন হয়?

গাণিতিক দক্ষতা কী?

মানুষের ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায় যে, আদি যুগে বিভিন্ন জিনিস গণনা এবং নিত্য কেনাবেচার হিসাব মেলাতে মানুষ গাণিতিক দক্ষতা গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছে। একইভাবে জমি মাপজোপ করার জন্য জ্যামিতিক জ্ঞান প্রয়োজন হত। আধুনিক যুগে বিভিন্ন বিষয়ের সংখ্যাগত পরিমাপের জন্য মানুষের মধ্যে গাণিতিক দক্ষতা অতি প্রয়োজন। এ দক্ষতা শুধু সমস্যার সমাধানই করে না, কম্পিউটার প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য গাণিতিক বুদ্ধি অত্যাবশ্যক। গণিতের সমস্যার সমাধান করে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন আনা হয়েছে তা কয়েক দশক আগে আমরা চিন্তাও করতে পারতাম না। শুধু গাণিতিক সূত্র, তত্ত্ব ও তথ্য সম্পর্কে জ্ঞান থাকলেই চলে না, মানুষের চিন্তন ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য ও সমস্যার সমাধান করার জন্য কী করে এই জ্ঞান কাজে লাগানো যায় তা বুঝতে হবে। একজন অভিজ্ঞ গণিতজ্ঞ এ কথা স্বীকার করেন যে, গাণিতিক সমস্যা সমাধান ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য বিশেষ মনোযোগ প্রয়োজন। গাণিতিক দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য ব্যক্তির সামনে যেগুলো প্রকৃত সমস্যা সেগুলো তুলে ধরা দরকার। গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে শিক্ষার্থীর সাধারণত যেসব দক্ষতা বৃদ্ধি পায় সেগুলো হলো:

- জীবনের বাস্তব সমস্যা সমাধানের জন্য যৌথ (অনেকের সাথে সম্মিলিত) ক্ষমতার বিকাশ ঘটে।
- সূক্ষ্ম চিন্তন ক্ষমতা ও যুক্তি প্রয়োগ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
- গাণিতিক কোন ধারণা গভীরভাবে বোঝা যায়।
- দলীয় কোন কাজে একে অপরের সাথে মতামত বিনিময় করা যায় এবং একে অপরকে সাহায্য করা যায়।

গণিতের অধিকাংশ পাঠ্যবইয়ে উদাহরণ হিসেবে অল্পসংখ্যক সমস্যার বিস্তৃত সমাধান দেয়া থাকে এবং পরে অনুশীলনীতে একই প্রকার সমস্যা উপস্থাপন করা হয়। শুধু এক প্রকার সমস্যার সমাধান করলে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা খুব বেশি হয় না। শিক্ষার্থীর প্রকৃত শিখন হওয়ার জন্য অনুশীলনীতে কিছু শক্ত সমস্যা দেয়া উচিত যা সমাধান করতে শিক্ষার্থীকে যথেষ্ট গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে। শিক্ষার্থী যদি সমস্যা সমাধানের জন্য গভীরভাবে চিন্তা করতে শেখে এবং মাথা খাটাতে শেখে তাহলে গাণিতিক লক্ষ্য অর্জনের দিকে সে এগিয়ে যাবে। প্রশ্ন হল গাণিতিক লক্ষ্য কী?

সমাজ ও ব্যক্তি জীবনে নানা ধরনের সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য গাণিতিক বুদ্ধি প্রয়োগ করা এবং আধুনিত প্রযুক্তি পরিচালনায় গাণিতিক গণনা (calculation) ও কৌশল ব্যবহার করাই হল গাণিতিক লক্ষ্য। এর জন্য আপনাকে গণিতে যেসব দক্ষতা উন্নয়ন করতে হবে তা হলঃ

- সমস্যার সমাধান করা
- তথ্য বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা
- যুক্তিসিদ্ধ চিন্তা করা
- প্রক্রিয়াগত দক্ষতা আয়ত্ত করা
- সংগঠন করার দক্ষতা আয়ত্ত করা
- সূক্ষ্ম চিন্তা করা
- দলবদ্ধভাবে কোন কাজ করা
- পরিমাপগত ধারণা লাভ করা
- সংখ্যা গণনায় দক্ষ হওয়া
- কম্পিউটারের ভাষার সাথে পরিচিত হওয়া।

আপনি যদি এ লক্ষ্য অর্জন করতে পারেন তবে গাণিতিক দক্ষতা অর্জন সার্থক হবে।

গাণিতিক দক্ষতা উন্নয়ন

যে কোন কাজের সাথে গাণিতিক নীতি এবং ধারণার একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে। আপনি যদি গাণিতিক নীতি ও গণনায় পারদর্শী হন তাহলে যে কোন কাজে আপনি সফল হবেন। গাণিতিক গণনা বা ধারণার দক্ষতা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য। আপনি যা কিছুই শিখতে যান বা যা কিছুই করতে যান গাণিতিক দক্ষতা একটি সাহায্যকারী গুণ

হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন। সুতরাং নিজের ভিতর গাণিতিক দক্ষতা কীভাবে গড়ে তোলা যায় আসুন এবার সেগুলো আলোচনা করি।

গাণিতিক দক্ষতা গড়ে তোলার উপায়

আমাদের দেশে স্কুলের অধিকাংশ ছেলেমেয়েরা গণিত বিষয়টিকে ভয় পায়। এ কারণে গণিত ক্লাসে তারা আনন্দবোধ করে না ও গণিত শিক্ষককে এড়িয়ে চলে। শিক্ষক যখন ক্লাসে অংক করান তখন মনোযোগী হতে পারে না। ফলে পরীক্ষায় তারা অকৃতকার্য হয় বা কম নম্বর পায়। এখানে শিক্ষকের দায়িত্ব সর্বাধিক। শিক্ষার্থীকে গাণিতিক সমস্যাটিকে বুঝিয়ে দেয়া তার প্রধান কাজ। শিক্ষার্থী যদি বোঝে যে সমস্যাটি কোথায় বা কীসের সমাধান চাওয়া হচ্ছে তাহলে যথাযথ সূত্র প্রয়োগে সে নিজেই সমাধান করতে পারবে।

একই কথা আপনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। গাণিতিক দক্ষতায় আপনি যদি দুর্বল হন তবে নির্দিষ্ট কোন শ্রেণীর গণিত বই খুলে প্রতিদিন বসুন এবং সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী হোন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সমস্যার সমাধান দেয়া আছে এমন কোন বইয়ের সাহায্য নেবেন না। মনে রাখবেন সমস্যা কী এবং কি সমাধান চাওয়া হচ্ছে তা আপনাকে বুঝতে হবে। সমাধান নিজে করার চেষ্টা করুন।

শিক্ষকের সাহায্য নিন।

গণিত যদি আপনার নৈর্বাচনিক বিষয় হয়ে থাকে তবে তো খুব সহজেই সাহায্য নেয়ার জন্য একজন শিক্ষককে পেয়ে যাবেন। আর যদি নৈর্বাচনিক বিষয় না হয়, তবে যে কোন গণিত শিক্ষক যিনি আপনার কাছে সহজলোভ্য তার কাছে যান। গণিতে আপনার দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে তিনি আপনাকে সর্বত্তোম সাহায্য করতে পারবেন। শিক্ষকের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি আপনার সমস্যা অর্থাৎ কোথায় আপনি দুর্বল তা সহজেই বুঝতে পারবেন।

গাণিতিক সমস্যার কোথায় আপনি বুঝতে পারছেন না বা কোথায় দূর্বোধ্য মনে হচ্ছে শিক্ষককে তা স্পষ্ট করে বলুন। শিক্ষক তাহলে আপনার সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পাবেন। অর্থাৎ আপনাকে বোঝাতে সক্ষম হবেন। আর যদি আপনি আপনার সমস্যা না বোঝেন তবে শিক্ষককে বলুন শিক্ষক নিজেই তা অনুসন্ধান করে নেবেন।

সাহায্যকারী বইয়ের সাহায্য নিন।

শিখন প্রক্রিয়া সকলের জন্য একরকম হয় না। এক একজন এক একভাবে শেখে। গণিতের ক্ষেত্রেও একথাটি সত্যি। আপনার জন্য শেখার কোন প্রক্রিয়াটি সহজ হবে বা কীভাবে শিখলে আপনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন তা আপনিই ভাল বুঝতে পারবেন। আগেই বলেছি, গাণিতিক দক্ষতা উন্নয়নের জন্য সর্ব প্রথম দরকার আপনার সমস্যা কোথায় তা খুঁজে বের করা। আপনি যখন সাহায্যকারী বইটি খুলবেন, তখন দেখুন তো অংকটি (যা সমাধান করা আছে) কী আপনি বুঝতে পারছেন?

মনে রাখবেন আগেই বলেছি, সমাধানটি মুখস্থ করবেন না। যদি মুখস্থ না করেন, তবে আপনার সমস্যা অর্থাৎ কোথায় আপনি বুঝতে পারছেন না তা খুঁজে বের করুন। এবার সমস্যার স্থানটি আপনার খাতায় লিখুন। হতে পারে কোন সূত্রের প্রয়োগ বা সূত্রের সরলীকরণ ইত্যাদি যে কোন জায়গায় আপনার সমস্যা আছে। একবার যদি খুঁজে বের করতে পারেন তখন শিক্ষকের সাহায্য নেয়া আপনার জন্য সহজ হবে।

গাণিতিক সমস্যার মোকাবেলা করবেন কীভাবে?

গাণিতিক সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তা করা এবং তা বুঝতে পারা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। অনেক সময় কোন বিষয়টির সমাধান চাওয়া হচ্ছে তা বুঝতে পারা বেশ কঠিন। যখন সমাধানের বিষয়টি বুঝতে পারছেন না তখন নিজেকে নিচের প্রশ্নগুলো করুন।

- সমাধানের ক্ষেত্র বুঝতে সমস্যার সম্পূর্ণ তথ্য কি প্রয়েজান হবে?

- এ ছাড়া আরও কোন তথ্যের প্রয়োজন আছে কি?
- অন্যান্য সমস্যার সাথে এ সমস্যার মিল কোথায়?
- এ সমস্যাটিতে নতুন কী আছে, যা আমার কাছে কঠিন লাগছে?
- সমস্যার সংখ্যাগুলো যদি আর একটু ছোট হত, তবে কী সমাধান করতে পারতাম?

যদি তাই হয়, অর্থাৎ আপনি যদি সহজ অংকটি পারেন তবে সেটা আগে করুন। এবার অপেক্ষাকৃত কঠিনটির একটি চিত্র খাতায় আঁকুন, সমস্যায় নতুন যে বিষয়টি আছে তা নিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে ভাবুন এবং ধীরে ধীরে সমাধানের দিকে এগিয়ে যান।

গাণিতিক ভাষা বুঝতে পারছেন তো?

সাধারণত গণিতের ক্ষেত্রে একটু ভিন্ন রকম ভাষা ব্যবহার করা হয়। যেমন, ক্ষেত্রফল, সমষ্টি, সেট, ত্রিভূজ বা চতুর্ভূজ, সমীকরণ ইত্যাদি। সাধারণভাবে কথা বলায় আমরা এসব শব্দ ব্যবহার করি না। গাণিতিক দক্ষতা উন্নয়নের সূচনায় এসব শব্দের সাথে পরিচিত হোন এবং এদের ব্যবহার পদ্ধতি শিখুন। তবে শিক্ষক যখন এ শব্দগুলো ব্যবহার করবেন তখন শিক্ষকের কাছ থেকে সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা নিন এবং খাতায় তুলে ফেলুন। শব্দগুলো শুধু ব্যবহার করলেই চলবে না, এ সম্পর্কে ধারণা আপনার স্পষ্ট ও সহজ হতে হবে।

গণিত ভীতি দূর করুন

কোন কোন মানুষ আছে যারা মনে করে যে, তারা অংক পারে না। তারা ছোটবেলায়ও অংক পারত না এবং সে কারণে তারা যে অংক পারে না এ কথা তাদের মনে বদ্ধমূল হয়েছে। একেই বলে গণিত ভীতি। যাদের এই ভীতি আছে তাদের এটি এক ধরনের অনুভূতি। শিশুকালে এ অনুভূতিটি জন্ম নিয়েছে। অর্থাৎ তারা যে অংক পারে না এ কথাটি ঠিক না। গণিতের কোন সমস্যা দেখলেই তারা বলে আমি পারব না।
তাদের এ গণিত ভীতি দূর করার একটি সহজ উপায় হল:

— গাণিতিক সমস্যাটিকে কথা ও রেখার সাহায্যে এঁকে ফেলা।
— গণিতের প্রত্যেকটা ধাপের উপরে মনোযোগ দেয়া।
— প্রত্যেক ধাপে সমস্যাটি লিখে ফেলা ও প্রয়োজন হলে সমাধান করা।
— পরের ধাপের সাথে পূর্বের ধাপের কী সম্পর্ক আছে তা খুঁজে বের করা।
— একই প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ধাপ মোকাবেলা করা।
— এবার শেষ ধাপে কী চাওয়া হচ্ছে তা বোঝা এবং সমাধান করা।

এভাবে একবার যদি সমস্যা সমাধানে সফল হন, তবে পরবর্তী সমস্যায় এগিয়ে যেতে আপনি উৎসাহী হবেন।

কাজ - দুই

ষষ্ঠ শ্রেণীর গণিত বই থেকে ২.৩ অনুশীলনীর ৯ নম্বর থেকে ১৯ নম্বর পর্যন্ত সমস্যাগুলো নিজে সমাধান করুন।

সারসংক্ষেপ

গাণিতিক দক্ষতা মানুষের জীবনে যে কোন ক্ষেত্রে তার সফলতার মূল ভিত্তি স্বরূপ। গণিতের সংখ্যা, তার পারস্পারিক সম্পর্ক, বিচ্যুতি, সে সম্পর্কে ধারণাগত যৌক্তিক ও বিমূর্ত চিন্তন মানুষকে দৈনন্দিন জীবনে সকল ক্ষেত্রে নানা ধরনের সমস্যার সমাধান করতে পারদর্শী করে তোলে। এ কারণে জীবনের শুরু থেকেই গাণিতিক সমস্যা সমাধানে মনোযোগী ও দক্ষ হয়ে ওঠা একান্ত প্রয়োজন। পেশা ক্ষেত্রেও এ দক্ষতা তাকে ক্যারিয়ারের শীর্ষে পৌঁছে দিতে পারে। এজন্য প্রয়োজন-

- অখণ্ড মনোযোগ

- প্রতিদিন অনুশীলন
- গাণিতিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা
- বাস্তব জীবনে গাণিতিক জ্ঞান ও দক্ষতা ব্যবহার
- যে কোন সমস্যার মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত হওয়া
- গণিত ভয়কে দূর করা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। গণিতের সমস্যার সমাধান করতে সাহায্যকারী পুস্তক কীভাবে ব্যবহার করবেন?

ক. সমাধান দেখে নিয়ে
খ. সমাধান মুখস্ত করে
গ. অন্য সমস্যা দেখে
ঘ. সমস্যার প্রকৃতি বুঝে।

২। গণিত সম্পর্কিত ভয় দূর করতে কোনটি করবেন?

ক. বেশি করে গণিত অনুশীলন করবেন
খ. সমস্যা বিভিন্ন ধাপে সমাধান করবেন
গ. গণিত শিক্ষকের কাছে যাবেন
ঘ. সাহায্যকারী পুস্তক ব্যবহার করবেন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। আপনি নিজের গাণিতিক দক্ষতা গড়ে তোলার জন্য কী করবেন আলোচনা করুন।

২। ক্যারিয়ার গঠনে গাণিতিক দক্ষতার ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১২ : ১. ঘ ২. ক

পাঠ-৩.১৩ অনুভূতি, মনোভাব ও আচরণ এবং ক্যারিয়ার গঠনে ব্যক্তিগত আচরণ উন্নয়ন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- নিজের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত অনুভূতি প্রক্রিয়া গড়ে তুলতে পারবেন;
- ইতিবাচক মনোভাবাপন্ন হতে পারবেন;
- কাঙ্ক্ষিত অনুভূতি ও ইতিবাচক মনোভাবের সাহায্যে উন্নত আচরণ গড়ে তুলতে পারবেন;
- উন্নত আচরণের মধ্য দিয়ে ক্যারিয়ার গঠন করতে পারবেন।

প্রত্যেক মানুষই চায় সার্থক জীবনের অধিকারী হতে। তাই সে ক্যারিয়ার গঠন করতে চায়। মানুষের ব্যক্তিগত জীবন, তার চাকরি ও পেশা এবং পারিপার্শ্বিক অন্যান্য বহুক্ষেত্র থেকে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ইত্যাদির সমন্বয়ে একটি সাধারণ উৎকর্ষ ও উন্নত অবস্থা বা রূপকে ক্যারিয়ার বলে। অনেকে মনে করেন উপযুক্ত যোগ্যতা ও দক্ষতার বিনিময়ে একটি চাকরি জোগাড় করে, ধাপে ধাপে উত্তোরত্তর পদোন্নতি হলেই জীবনের সার্থকতা আসে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পেশাগত জীবনে ব্যক্তির সার্থকতা তো বটেই, সেইসাথে ব্যক্তি জীবনে সঞ্চিত তার জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, তার দৃষ্টিভঙ্গি, মনোভাব, তার আচরণ তার সার্থক ক্যারিয়ারসম্পন্ন জীবন গড়ে তুলতে সাহায্য করে। ব্যক্তির জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে তার দৃষ্টিভঙ্গি, মনোভাব ও আচরণ। সে অনুযায়ী অভ্যাস গড়ে ওঠে। ব্যক্তির মনোভাব, উপলব্ধি ও দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে তার আচরণ গড়ে ওঠে। তাই দেখা যায়, আচরণই হল শেষ কথা। অর্থাৎ সকল কিছুর বিনিময়ে সে সুন্দর আচরণ লাভ করে। সুতরাং সুদৃঢ় ক্যারিয়ার গঠনের জন্য মানুষকে উন্নত অভ্যাস ও আচরণ গঠনে মনোযোগী হতে হয়।

কাজ - এক

নিচের মনোভাব ও উপলব্ধিগুলো কিরূপ আচরণ গড়ে তুলবে লিখুন।

১. পরোপকারী মনোভাবাপন্নতা

২. আত্মকেন্দ্রিকতা

৩. বন্ধুভাবাপন্নতা

৪. উদারতা

৫. হিংসাত্মক মনোভাব

৬. ন্যায়পরায়ণতা

৭. সহিষ্ণুতা

৮. ভীত সন্ত্রস্ততা

৯. কঠোর মনোভাব

১০. আশাব্যঞ্জক উপলব্ধি

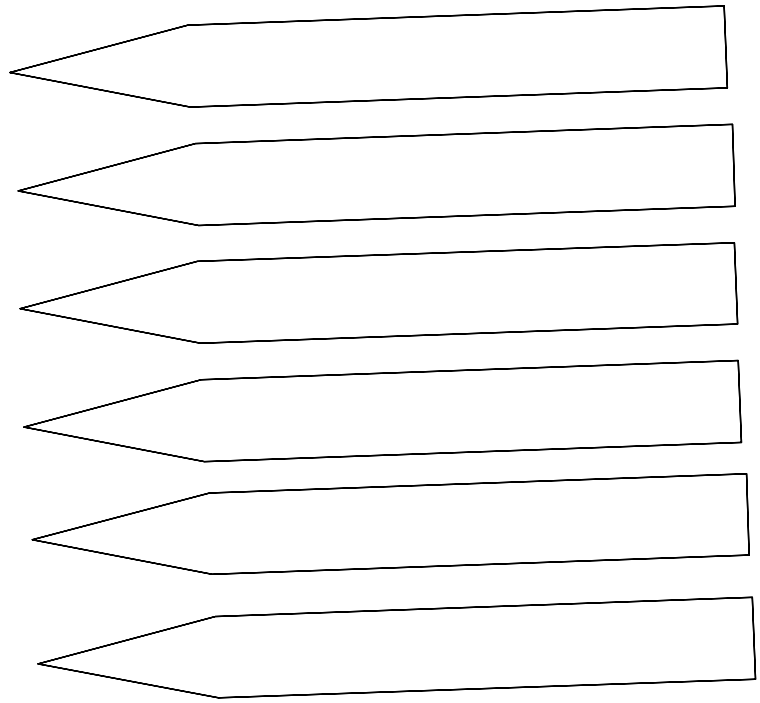

অনুভূতি

অনুভূতি প্রাণীর শরীরবৃত্তীয় একটি ক্ষমতা। এই ক্ষমতা প্রাণীকে উপলব্ধি করতে সক্ষম করে। অনুভূতি এবং তার কার্যকারিতা বা ক্রিয়া, শ্রেণীভেদ এবং তার তত্বীয় দিক ইত্যাদি একে অপরের সাথে বেশ ঘনিষ্টভাবে যুক্ত। আমরা এই বিষয়গুলো বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করি যেমন, স্নায়ুবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের জ্ঞানীয় অংশ এবং উপলব্ধির দর্শন ইত্যাদি। স্নায়ুতন্ত্রের একটি বিশেষ শাখা বা অঙ্গ হল ইন্দ্রিয়তন্ত্র বা সংবেদনশীলতন্ত্র। প্রাণীদেহে এই তন্ত্র প্রত্যেক অনুভূতির জন্য কাজ করে।

মানুষের বিভিন্নরকম অনুভূতি আছে। এর মধ্যে দৃষ্টি, শ্রবণ, স্বাদ, গন্ধ ও স্পর্শ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের এই পাঁচটি অনুভূতিকে খুব সহজেই বাহ্যিকভাবে চিহ্নিত করা যায়। অন্যান্য অনুভূতির মধ্যে তাপমাত্রা, ব্যথা, ভারসাম্য, নড়াচড়া এবং দেহের অভ্যন্তরীণ অন্যান্য সংবেদনশীলতা বা অনুভূতিকে উল্লেখ করা যায়।

অনুভূতিকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়, ‘অনুভূতি এক ধরনের প্রক্রিয়া যেখানে একগুচ্ছ সংবেদনশীল কোষ শারীরিক কোন বিশেষ অবস্থায় সাড়া দেয় এবং তারপর মস্তিষ্কের কোন বিশেষ অংশ বা অংশসমূহের সাথে যোগাযোগ করে। এরপর মস্তিষ্ক শারীরিক ঐ বিশেষ অবস্থার প্রতি কী প্রতিক্রিয়া হবে তা ঐ একগুচ্ছ কোষকে জানিয়ে দেয়।’ যেমন, আপনার আঙ্গুলে যদি খোঁচা লাগে তবে ব্যথা অনুভূত হয়। এটি ঘটে যখন আপনার আঙুলের স্নায়ুকোষগুচ্ছ খোঁচার বার্তা বয়ে নিয়ে মস্তিষ্কে যায় এবং মস্তিষ্ক ব্যথার অনুভূতির কথা স্নায়ুকোষকে জানিয়ে দেয়। প্রক্রিয়াটি মুহুর্তের মধ্যে ঘটে। এর ফলে আপনি ব্যথা অনুভব করেন।

নিচে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের পাঁচটি অনভূতি ব্যাখ্যা করা হল।

দর্শন বা দৃষ্টি

দর্শন হল চোখের ফোকাস করার ক্ষমতা। এখানে ফোকাস করা বলতে বস্তুর একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে আলো ফেলা, যেখানে আলো পড়লে বস্তুটি দেখা যাবে। কোন বস্তুর উপর যখন আলো পড়ে এবং মানুষ যদি ঐ বস্তুর দিকে তাকায়, তখন বস্তুর একটি প্রতিবিম্ব দুই চোখের রেটিনা নামক অঙ্গে তৈরি হয়। সেখানে স্নায়ুকোষ বস্তুর আকার, রং ও উজ্জলতা সম্পর্কে ধারণা দেয়। এই ক্রিয়াকে আমরা দর্শন বলি।

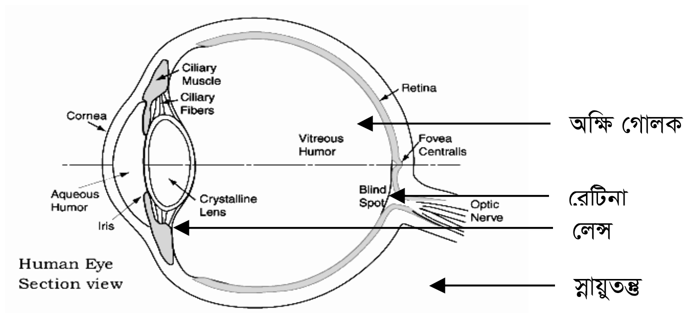

চোখ যখন দেখতে পায় না তখন আমরা তাকে অন্ধত্ব বলি। চোখের গোলকটি বিশেষ করে রেটিনা যদি নষ্ট হয়ে যায় তবে অন্ধত্ব দেখা দেয়। আবার চোখের স্নায়ুকোষ যা দর্শন অনভূতি নিয়ে মস্তিষ্কের সাথে যোগাযোগ করে, তা যদি শুকিয়ে যায় বা নষ্ট হয়ে যায় তাতেও অন্ধত্ব দেখা দিতে পারে।

শ্রবণ বা শোনা

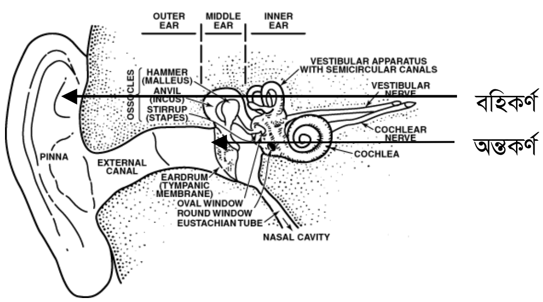

শব্দের অনুভূতিকে আমরা শ্রবণ বলি। বস্তুর কম্পন হলে বা বস্তু কাঁপলে আমরা সেই কম্পনের শব্দ শুনতে পাই। শোনা এক ধরনের যান্ত্রিক প্রক্রিয়া। বস্তু যখন কাঁপে তখন বাতাসের মাধ্যম হয়ে সেই কম্পন আমাদের কানে পোঁছায়। আমাদের কানের অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতগুলো হাড় পরপর সাজানো আছে। বস্তুর কম্পন আমাদের কানের পর্দাকে আঘাত করে, পরে উক্ত হাড়গুলোর মধ্য দিয়ে কম্পন পরিবাহিত হয়। এর ফলে অন্তকর্ণের স্নায়ুকোষ মস্তিষ্কে বার্তা কম্পন পাঠায়। তখন আমরা শুনতে পাই।

স্বাদ

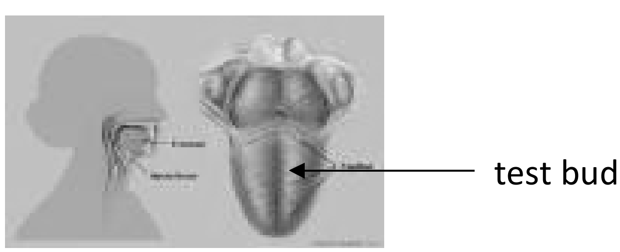

আমরা জিহ্বার সাহায্যে স্বাদ গ্রহণ করি। জিহ্বা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের একটি ইন্দ্রিয়। এই অনুভূতিটির বৈশিষ্ট্য হল এর সাহায্যে কোন পদার্থের স্বাদ গ্রহণ করা হয়। যেমন: খাদ্য, কোন খনিজ পদার্থ বা বিষাক্ত পদার্থ ইত্যাদি। জিহ্বার উপরিভাগে ছোট

ছোট দানার মত এক ধরনের সংবেদনশীল অঙ্গ দেখা যায় যাকে স্বাদ মুকুল বা test bud বলা হয়। মানুষ এই অঙ্গের মাধ্যমেই স্বাদ গ্রহণ করে।

গন্ধ

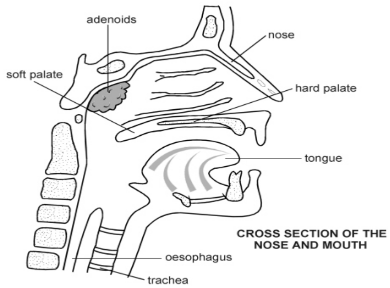

গন্ধ এক প্রকার রাসায়নিক অনুভূতি। নাকের সাহায্যে আমরা গন্ধ পাই। নাকের মধ্যে শত শত স্নায়ুবিক তন্তু থাকে। এই তন্তুগুলো একটি আণুবীক্ষণিক পদার্থের সাথে আটকানো থাকে। বিভিন্ন পদার্থ থেকে যে গন্ধ বের হয় তা কম বেশি হয়ে এই স্নায়ুবিক তন্তুতে পৌঁছায়। গন্ধ সম্বন্ধনীয় তথ্য স্নায়ুবিক তন্তু হয়ে মস্তিষ্কে পৌঁছায়। মস্তিষ্ক যখন নির্দেশ দেয় তখন আমরা গন্ধ পাই।

স্পর্শ

আমরা শুধু গায়ের চামড়া ও লোমের সাহায্যে স্পর্শ অনুভব করি না, জিহ্বা ও গলার ভিতরেও এই অনুভূতি আছে। চামড়ায় ও জিহ্বায় স্নায়ুবিক তন্তু আছে। এর কার্যকারিতায় আমরা স্পর্শ অনুভব করি। আমাদের শরীরে যে চুলকানি বা পোকার কামড়ে যে চুলকানি হয় তা চামড়ার নিচে বিশেষ ধরনের স্নায়ুকোষের মাধ্যমে আমরা অনুভব করি। কেউ যদি খুব জোরে হাত ধরে তাহলে আমরা ব্যথা অনুভব করি, এর কারণ হল যত জোরে চাপ দেয়া হবে ভিতরে গভীরে তত বেশি স্নায়ুবিক তন্তু আলোড়িত হবে বা চাপ অনুভব করবে।

মনোভাব ও আচরণ

কোন বিষয় যেমন- কোন ব্যক্তি, ঘটনা, স্থান, বস্তু ইত্যাদি সম্পর্কে মানুষ যখন পক্ষে বা বিপক্ষে মতামত দেয় তখন তার মনোভাব সম্পর্কে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অর্থাৎ মানুষ যখন কোন বিষয় সম্পর্কে তার মূল্যায়ন প্রকাশ করে তখন তার মনোভাব বোঝা যায়। এই মনোভাব ইতিবাচক বা নেতিবাচক হতে পারে। যদি ইতিবাচক হয় তবে সেই মনোভাবের দ্বারা তাড়িত হয়ে কোন কাজ করে বা জীবন নির্বাহ করে। অন্যদিকে কোন বিষয়ের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব থাকলে মানুষ বিষয়টিকে এড়িয়ে চলে। এভাবে দেখা যায়, মানুষের আচরণ গড়ে ওঠে তার মনোভাবের উপর নির্ভর করে। কেউ যদি মনে করে যে জ্ঞানী ব্যক্তি সমাজে মর্যাদাশীল, তবে নিজে সে জ্ঞানী হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা করবে অর্থাৎ বেশি করে বই পড়বে ও জ্ঞান সংগ্রহ করার জন্য বা জানার জন্য সে সব ধরনের প্রচেষ্টা চালাবে।

কোন কোন বিষয়ের উপর মানুষের খুব জোরালো ইতিবাচক বা নেতিবাচক মনোভাব থাকতে পারে। এমন ক্ষেত্রে সে বিষয়টিকে জীবনের সাথে গভীরভাবে সংযুক্ত করে বা নেতিবাচক মনোভাব হলে জীবন থেকে তাকে দূরে সরিয়ে দেয়। যেমন, আপনি যদি ধূমপানকে অপছন্দ করেন তবে ধূমপান তো নিজে ত্যাগ করবেনই সেই সাথে অন্যের ধূমপানও অপছন্দ করবেন। সুতরাং ইতিবাচক মনোভাব বিষয়ের প্রতি মানুষকে মনোযোগী করে তোলে। অন্য কথায় বলা যায় যে ব্যক্তিকে কোন বিষয়ে মনোযোগী করে তুলতে হলে তার প্রতি তার ইতিবাচক মনোভাব জোরালোভাবে গড়ে তুলতে হবে। অনেক সময় মানুষ কোন কিছুর উপর তার মনোভাব ব্যাখ্যা করতে পারে না বা ঠিক বলতে পারে না। এ অবস্থায় তার আচরণ দেখে পছন্দ,আগ্রহ, মনোযোগ বা অপছন্দ পরিমাপ করা যায়। মনোভাবের তিনটি দিক দেখা যায়:

- জ্ঞানীয়
- আবেগিক ও
- আচরণিক

জ্ঞানীয় মনোভাব: কোন কিছু সম্বন্ধে ব্যক্তির বিশ্বাস ও চিন্তাকে মনোভাবের জ্ঞানীয় প্রকাশ বলা হয়। অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তির মনোভাব তার ইতিবাচক ও নেতিবাচক ধারণার উপর নির্ভর করে।

আবেগিক মনোভাব: কোন কিছুর উপর অনভূতি বা আবেগ মানুষ বিভিন্নভাবে প্রকাশ করে। যেমন, আপনি যদি মাকড়সাকে ভয় পান তবে মাকড়সা গায়ে উঠলে আপনি চিৎকার করে উঠবেন। চিৎকার করে ওঠা আপনার আবেগের বহিঃপ্রকাশ।

আচরণিক মনোভাব: আমরা আগেই শুনেছি কোন বিষয়ের উপর মানুষের মনোভাব তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গঠনে সাহায্য করে। যেমন, আপনি যদি স্বাস্থ্য সচেতন হন বা সুগঠিত স্বাস্থ্যের প্রতি অনুরাগী হন তবে আপনি নিয়মিত ব্যায়াম করবেন, হাঁটবেন বা সুন্দর স্বাস্থ্য গড়ে ওঠে এমন কাজ করবেন। কিন্তু স্বাস্থ্য নষ্ট হয় এমন কাজ কখনই করবেন না। অতএব স্বাস্থ্য সচেতনতা আপনার আচরণ ও কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। এভাবে মানুষ তার মনোভাব অনুযায়ী দক্ষতা উন্নয়ন করে এবং প্রয়োগ করে।

ক্যারিয়ার গঠনে ব্যক্তিগত আচরণ উন্নয়ন

ব্যক্তিগত আচরণ উন্নয়ন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে জানার পূর্বে ক্যারিয়ার কী তা জানা বিশেষ প্রয়োজন। আমরা ইউনিট এক এ ক্যারিয়ার সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। সেখানে আমরা জানতে পেরেছি যে, মানুষ তার ক্যারিয়ার জীবনের দীর্ঘ সময় ধরে গড়ে তোলে। শুধু কর্মক্ষেত্র এবং পেশাক্ষেত্র থেকে অর্জনের মধ্য দিয়েই নয়, মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের অর্জনের সমন্বিত রূপ ক্যারিয়ারের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ মানুষ সারা জীবনে যা অর্জন করে কর্ম ও পেশাজীবন এবং দৈনন্দিন জীবনেও তার প্রভাব প্রতিফলিত হয়। এভাবেই সে ধীরে ধীরে একজন ক্যারিয়ারসম্পন্ন ব্যক্তি হয়ে ওঠে। সুতরাং দেখা যায় প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যক্তির আচরণ তার কর্মকে প্রভাবান্বিত করে। সে কারণে ক্যারিয়ার গঠনে ব্যক্তির আচরণ উন্নয়ন অত্যাবশ্যক। পেশাক্ষেত্রে প্রবেশের জন্য বা চাকরি পাওয়ার জন্য মানুষের নির্দিষ্ট যোগ্যতা ও দক্ষতার প্রয়োজন হয়। যথেষ্ট যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকলে চাকরিতে বহাল থাকা যায়, এমন কি অনেক সময় পদোন্নতিও ঘটে। কিন্তু চাকরিক্ষেত্রে সুনাম বৃদ্ধি এবং উৎকর্ষ লাভের জন্য তার যোগ্যতাই যথেষ্ট নয়, তার আচরণ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিশেষ ভূমিকা রাখে। কাজের ক্ষেত্রে ব্যক্তির আচরণ তার কাজের পরিবেশ তৈরি করে। এমন পরিবেশ যেখানে সে নিজে এবং তার সহকর্মী সকলেই কাজে আনন্দ পায় ও স্বাচ্ছন্দ্য থাকতে পারে। সে কারণে পেশাক্ষেত্রে একজন কর্মীর উন্নত আচরণ বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। আচরণ উন্নয়ন এক ধরনের মনোস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি তার পরিবেশের সাথে শারীরিকভাবে, মানসিকভাবে ও আবেগিকভাবে সরাসরি ক্রিয়া করতে শেখে। এই পরিবেশ ব্যক্তির জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য প্রযোজ্য। একজন ক্যারিয়ারসম্পন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন ক্রিয়ার মাধ্যমে তার পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করতে পারে। আসুন, আমরা দেখি মানুষ কী উপায়ে ক্যারিয়ার গঠনের জন্য তার আচরণ উন্নয়ন করতে পারে।

একজন আদর্শ ক্যারিয়ারসম্পন্ন ব্যক্তিকে অনুসরণ - আপনার চারপাশের জগতে একজন ক্যারিয়ারসম্পন্ন ব্যক্তির অনুসন্ধান করুন। তার সাথে অন্তরঙ্গ হওয়ার চেষ্টা করুন। তার কথাবার্তা, কথা বলার কৌশল, তার চলন, ভাবনা-চিন্তা, তার কর্ম ও

কর্মকৌশল, তার মনোভাব, পছন্দ ও অপছন্দ ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করুন ও অনুসরণ করুন। দেখবেন ধীরে ধীরে ক্যারিয়ার গঠনের দিকে আপনি এগিয়ে চলেছেন।

সময় সচেতনতা: একটি প্রচলিত প্রবাদ আছে যে, "সময় কারও জন্যে অপেক্ষা করে না।" বাস্তবক্ষেত্রে কথাটি নি:সন্দেহে সত্য। সময় প্রতিনিয়ত গড়িয়ে চলছে, কেউ তার ব্যবহার করুক আর না করুক। কেউ যদি সময়মতো কোন কাজ না করে, পরে করবে বলে ফেলে রাখে, তবে দেখা যায় কাজ জমে কাজের পরিমাণ অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। এত কাজ একসাথে করতে যেয়ে কাজের মান খারাপ হয়ে যায়। অথচ ঐ কাজ সময়ে করলে ধীরেসুস্থে ভালভাবে সম্পন্ন করা যায়। এজন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সময়মতো কোন কাজ করা একটি উত্তম অভ্যাস। ক্যারিয়ার গঠনের জন্য এ অভ্যাসটি গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন।

আত্মবিশ্লেষণ: নিজেকে বিশ্লেষণ করুন। প্রতিনিয়ত নিজের কথাবার্তা, চালচলন, কর্মকৌশল নিজে খুব সন্তর্পণে পর্যবেক্ষণ করুন। আপনার দুর্বল দিকগুলো খুঁজে বের করুন এবং সংশোধন করতে করতে সামনে এগিয়ে চলুন। একজন সার্থক মানুষ হয়ে গড়ে ওঠার জন্য আত্মবিশ্লেষণের কোন বিকল্প নাই। নিজের ত্রুটি খুঁজে বের করা খুবই কঠিন কাজ। এ কাজ যে করতে পারে তার সম্ভাবনা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে সুঅভ্যাস গড়ে তোলা যায় এবং সুঅভ্যাস ক্যারিয়ার গঠনের অন্যতম শর্ত।

দায়িত্বসম্পন্নতা ও কর্তব্যপরায়ণতা: মানুষের জীবনের সবক্ষেত্রেই কিছু না কিছু কাজ নির্ধারিত থাকে। সেসব কাজ সময়মতো দায়িত্ব নিয়ে করা একটি বিশেষ যোগ্যতা। যিনি দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেন তার কাজে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। তিনি জ্ঞানগর্ভ এবং কর্মকুশলী। জীবন চলার পথে তার সহকর্মী ও সতীর্থরা তাকে অনুসরণ করে। শুধু কাজই নয়, একজন দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তি যথেষ্ট দায়িত্ব নিয়ে কথা বলেন। এর অর্থ হল, তিনি যা বলেন তা সত্য এবং নির্ভরযোগ্য। আপনি যদি তার কথা মেনে চলেন তবে ভাল ফল লাভ করবেন। দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তি তার করণীয় কাজ সম্পর্কে সচেতন থাকেন। অর্থাৎ উপযুক্ত সময়ে কোন কাজটি তাকে করতে হবে এ ব্যাপারে তিনি সদা সতর্ক। দেখা যায়, মানুষ তার বিপদে আপদে কর্তব্যপরায়ণ কোন ব্যক্তির শরনাপন্ন হয়। এর কারণ হল, তিনি জানেন কখন, কী তাকে করতে হবে এবং কী উপায়ে তা করতে হবে।

পরিশ্রম করুন: কোন কাজকেই ছোট করে দেখা উচিত নয়। যখনই যে কাজ হাতের কাছে পাবেন, দায়িত্ব নিয়ে সে কাজটি করবেন। আপনি একা না পারেন অভিজ্ঞ ও দক্ষতাসম্পন্ন একজনের সাহায্য নিতে পারেন। তবে কাজটি অবশ্যই করবেন। এড়িয়ে যাবেন না বা পাশ কাটিয়ে যাবেন না। অর্থাৎ নিজেকে কর্মপরায়ণ ও কর্মকুশলী করে গড়ে তুলতে হবে। অলসভাবে সময় কাটাবেন না বা কোন কাজ করতে গড়িমসি করবেন না। যিনি পরিশ্রমী তার কাজ কখনও পড়ে থাকে না। সঠিক সময়ে সঠিক কাজটি করতে পারেন বলে জীবনে তিনি সার্থক ও প্রতিষ্ঠিত হন।

কাজ - দুই

ক্যারিয়ার গঠনের জন্য ১০টি আচরণ চিহ্নিত করুন। এ আচরণগুলো কীভাবে নিজের মধ্যে গড়ে তুলবেন তা বিস্তারিত লিখুন।

সারসংক্ষেপ

মানুষের মনোভাব ও অনভূতির সমন্বয়ে তার আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের যে সংবেদনশীলতা তাকে অনুভূতি বলে। সকল মানুষই এই অনুভূতিসম্পন্ন হয়, তবে মানুষের মানসিক সামর্থ বা ইচ্ছা অনুযায়ী সে দেখে, শোনে বা স্বাদ গ্রহণ করে। একই বিষয় বা বস্তু মানুষ কীভাবে দেখবে বা শুনবে তা তার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ সে ইচ্ছা করলে নিজের অনুভূতি নিজে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। একইভাবে মনোভাবও মানুষের পছন্দ ও মানসিক ক্ষমতার উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে। এ ক্ষেত্রেও সে তার ইচ্ছা অনুযায়ী মনোভাব গড়ে তুলতে পারে। এ দুয়ের প্রভাবে ব্যক্তির আচরণ গড়ে ওঠে। ব্যক্তি যদি তার মধ্যে ইতিবাচক আচরণ গড়ে তুলতে পারে তবে তার মধ্যে সুঅভ্যাসসমূহ জন্ম নেবে। সুঅভ্যাস বা এইসব আচরণ তাকে ক্যারিয়ারসম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করে। ক্যারিয়ার মানুষের সুদীর্ঘ জীবনের অর্জন ও

ফসল। মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনে যখন তার ইতিবাচক আচরণ প্রয়োগ করে, প্রতিটি ক্ষেত্রে সে সফল হয়। ছোট ছোট সফলতা তার জীবনকে মহিমান্বিত করে তোলে। ফলে সুস্থ ও সুন্দর জীবন পরিচালনার মাধ্যমে সে ক্যারিয়ার গঠন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মানুষের মনোভাব প্রকাশ হওয়ার অন্যতম মাধ্যম কি?
- ক. স্বভাব
- খ. অনুভূতি
- গ. আচরণ
- ঘ. দর্শন।

২। মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে, এর কারণ কী?
- ক. মানুষ উপলব্ধি করতে শেখে
- খ. তার মনোভাব গঠিত হয়
- গ. তার অনুভূতি সক্রিয় হয়
- ঘ. তার অভ্যাস গঠিত হয়।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। ক্যারিয়ার গঠনের জন্য আচরণ উন্নয়নে প্রয়োজনীয় মনোভাব কী? এ মনোভাব গঠনের জন্য আপনার করণীয় কি তা ব্যাখ্যা করুন।

২। ক্যারিয়ার গঠনে ব্যক্তির আচরণের ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন

মাসুদ সাহেব প্রতিদিন খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠেন। প্রতিদিনের কাজ ঠিক ঠিক সময় মত করা তার একটি অভ্যাস। প্রায় শিশুকাল থেকেই তিনি এ অভ্যাসের বশবর্তী। তার আর একটি অভ্যাস হল কাজের প্রতি অখণ্ড মনোযোগ। যে কাজই তিনি করুন খুব মনোযোগ দিয়ে করেন। এর জন্য তিনি যে কাজে হাত দেন তা নির্ভুল ও সফল হয়। সফলতা পেতে পেতে আজ তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। এ প্রতিষ্ঠা তার নিজের অর্জন।

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন

১. নিষ্ঠা কী?

২. কর্মজীবনে নিষ্ঠার প্রয়োজন হয় কেন?

৩. মাসুদ সাহেবের প্রতিদিনের কাজের একটি দিনপঞ্জিকা তৈরি করুন।

৪. কর্মজীবনে মাসুদ সাহেবের প্রতিষ্ঠার কারণ ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১৩ : ১. গ ২. খ